নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

সংকলন ১৪। ■ সেপ্টেম্বর ২০১৮

নবদিশা
শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে
সংকলন ১৪ । সেপ্টেম্বর ২০১৮

সম্পাদকীয়

কর্মভিত্তিক শিক্ষা

সভ্যতার আদিযুগে যাবতীয় শিক্ষাই ছিল কাজ ও অভিজ্ঞতা নির্ভর। পরবর্তী যুগে কাগজ ও ছাপাখানা শুরু হতে শিক্ষা ক্রমেই ভাষাভিত্তিক ও পুঁথিসর্বস্ব হয়ে উঠতে থাকে। জাতীয় পুঁথিগত বিদ্যায় শিশুদের বুদ্ধির বিকাশে মুখস্ত ক্ষমতার উপর খুব জোর দেওয়া হয়। ফলে গতানুগতিক শিক্ষায় শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না। যেখানে পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক খুবই কম। শিশুরা কাজ করতে ভালবাসে, কাজের মধ্যে সে খেলার আনন্দ পায়।

কর্মশিক্ষা প্রকৃতপক্ষে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে এই শিক্ষা আয়ত্ত করতে হয়। অনেকে শিল্পকেন্দ্রীক শিক্ষাকে কর্মভিত্তিক শিক্ষার সঙ্গে এক করে ফেলেন। আসলে শিল্প-শিক্ষা এক ধরনের কর্মমূলক শিক্ষা হলেও, সৃজনাত্মক কাজে যে আনন্দ থাকে শিল্পকর্মে তেমনটা থাকে না। কর্মের মধ্যে দিয়েই শিশুদের আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়।

শিশুরা যদি এই শিক্ষার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে তবে জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকা বিষয়গুলির ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে তারা একটা সম্পূর্ণ পরিচয় পাবে। এই শিক্ষা বিদ্যালয় ও পল্লীসমাজকে বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সংযুক্ত করে। ঘর থেকে বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় থেকে সমাজের সব স্তরে শিক্ষার পরিবেশ ছড়িয়ে পড়ে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিক্ষা এখানে সম্পূর্ণ হওয়ার সুযোগ পায়।

কর্মভিত্তক শিক্ষা পদ্ধতিতে হাতে-কলমে কাজ করতে করতে শিশুমনে নানা বিষয়ে প্রশ্ন জাগে। যা শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সুদৃঢ় করে তোলে, প্রাণবন্ত হয়ে উঠে শিক্ষা প্রক্রিয়া। সামাজিক উৎসব, মেলা, সৃজনাত্মক কাজ, সামুদায়িক জীবনযাপন ইত্যাদি নিয়েই জীবন কেন্দ্রীক এই শিক্ষা।

সূচিপত্র

১। জীবন থেকে শেখা ২
২। 'সমগ্র শিক্ষা অভিযান' এবং বিদ্যালয় শিক্ষার, ... ৪
৩। ছুঁয়ে এলাম মেধা বলয়, ... ৫
৪। নাটকের মাধ্যমে শিক্ষা-কার্যক্রম, ... ৮
৫। শ্রেণিকক্ষের বাইরের শিক্ষাই প্রকৃত, ... ৯
৬। সৃজনের অনন্ত প্রবাহ এবং অন্য সংস্কৃতির, ... ১০
৭। বিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী ১১
৮। বিদ্যালয়ে স্থানীয় দক্ষ ব্যক্তিদের ব্যবহার ১৪
৯। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে সাংস্কৃতিক, ... ১৫
১০। নবদিশার বইয়ের টেবিলে ১৬
১১। *বিখ্যাত চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষা* ঃ জে.পি.নায়েক ১৭
১২। *এসো তাঁদের গল্প শোনাই* ঃ বিবেকানন্দ ১৯
১৩। *সেই সময়* ঃ বীরভূম ২২
১৪। শিখনের আনন্দ, আনন্দময় শিখন, ... ২৪
১৫। প্রাচীন সভ্যতায় শিক্ষার পত্তন ও, ... ২৫
১৬। শ্রেণিকক্ষের বাইরের শিক্ষাই প্রকৃত ও, ... ২৮

জীবন থেকে শেখা

সুদেব কুমার বিশ্বাস

আমরা এই ছোট্ট জীবনে কত জনের কাছ থেকে কত ভাবে শিখি। জীবন থেকে শেখা আমাদের অন্যতম পাথেয়। কেউ কেউ সচেতনভাবে শেখান। একেবারে হাতে ধরে শেখান। কেউ আবার নিজের নিয়মে কাজ করে যান, আর আমরা তা থেকে যা শেখার শিখে নিই। যে নিংড়ে নিতে পারে সে ধন্য; যে পারে না, তাকে একটু পেছনেই পড়ে থাকতে হয়। একটি গ্রাম বা লোকালয় কারও কাছে হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। সে জীবনকে জীবনের পথে চলতে দেখে সেখান থেকে শেখে। শেখে মানুষের টিকে থাকার লড়াই করতে দেখে। জ্ঞানের যে উৎসভূমি—সেই মানবজীবন আর মানব সমাজ হয়ে ওঠে জ্ঞান আহরণের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। আমরা একেকজনের কাছ থেকে স্বতন্ত্র কোনও বিষয় শেখার সুযোগ পাই। কে জানে, আমাকে-আপনাকে দেখেও অনেকে অনেক কিছু শিখছে। যারা শেখান, তাদের কেউ কেউ গুরুর আসনে বসে যান।

একটি প্রশিক্ষণে ড. ফন্দেজ বললেন, "তোমরা কি জান রাস্তায় যে শিশুরা বাদাম বিক্রি করে, তারা কীভাবে টাকার হিসেব করে? ওরা তো অনেকে বিদ্যালয়েই যায়নি কোনওদিন। তাহলে হিসেবটা শিখল কীভাবে? শিক্ষককে আর শিশুকে শেখাবার আগে ওদের কাছে যাও। দেখ, ওরা কীভাবে শিখেছে। ওদের প্রথাগত জ্ঞান কীভাবে অর্জিত হল, তা শিখে আসো আগে, তারপর তোমার শিশুকে শেখাও। আর তোমার শিক্ষককে শেখাও কীভাবে প্রথাগত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া যায়। শিক্ষককে শেখাও যে, জ্ঞান বইয়ে থাকে না, পণ্ডিতের মাথায়ও থাকে না। থাকে বাস্তব জীবনে, সাধারণ মানুষের মাঝে, মানব সমাজে। তাই শিশুকে শেখানো শুরু করো জ্ঞানের উৎস থেকে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শেখাও। আর যা কিছু শেখাও, তা আবার ওদের বাস্তব জীবনের সাথে যুক্ত করে দাও। ওরা বুঝতে শিখুক, যা শিখছে তা কেন শিখছে। যেটি শেখার দরকার নেই, সেটি ওরা শিখবে না—এ সিদ্ধান্তও ওরা নিতে শিখুক।"

শিশুরা বিদ্যালয়ের বাইরে চারপাশের পরিবেশ থেকে, মা-বাবা বা দাদা-দাদীর কাছ থেকে অথবা অন্য কারও কাছ থেকে এমনি-এমনিই অনেক কিছু শিখে যায়। যেমন হিসেব করা। ওরা হয়তো এখনও সংখ্যাই ভাল করে চেনে না, কিন্তু হিসেব করতে শিখে গেছে। দোকানে ২০ টাকা নিয়ে গেলে খুব ভালভাবে জিনিসপত্র কিনে টাকার হিসেব করতে পারে। গাছে পাখি বসে থাকে দলে দলে। সেখান থেকে কয়েকটা উড়ে যায়। আর কয়টা এখনও বসে আছে সে হিসেব ওরা ঠিক বের করে ফেলে। ওরা ঠিক জানে ওদের কটা জামা আছে। বাড়িতে কয়জন মানুষ আছে। তার মানে যোগ ও বিয়োগের ধারণা তারা বিদ্যালয়ে আসার আগেই পেয়ে যায়। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা যত বেশি, হিসেব করার দক্ষতা তত ভাল। যে ছেলেটি ক্রিকেট খেলা পছন্দ করে, সে রানের হিসেবটাও ভালই করতে পারে। জেনে যায় কত হলে সেঞ্চুরি

বা হাফ-সেঞ্চুরি হয়। বাস্তব জীবনের এই অভিজ্ঞতাকে কেন আমরা কাজে লাগাই না? কেন আমরা মনে করি, ওরা গুনতে পারে না, তাই গোনা শেখাচ্ছি? যোগ পারে না, তাই যোগ করা শেখাচ্ছি? বিয়োগের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম।

আরেকটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। একদিন একটি ক্লাসে গিয়ে দেখি, শিক্ষক যোগ অঙ্ক শেখাচ্ছেন। একেবারেই অর্থহীন যোগ অঙ্ক। ১০-এর সাথে ৮ যোগ করলে কত হয়। ১০ কোত্থেকে এলো, আর ৮-এর বাড়ি কোথায় সে কথা কাউকেই বলা হল না। দেখলাম, কেউ কেউ পারছে; বেশিরভাগই পারছে না। একটু তলিয়ে দেখার কৌতূহল হল। শিক্ষককে এক কোণায় ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—যারা পারছে না, তারা কেন পারছে না বলে আপনার মনে হয়? শিক্ষক কিছু মুখস্ত কথা বলে দিলেন। ওরা পড়াশোনায় একেবারেই মনোযোগী নয়, মা-বাবা সচেতন নয়, নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসে না ইত্যাদি। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু ঠিক কী কারণে ওরা এই যোগ অঙ্কটি করতে পারছে না? তাঁর মাথায় বিশেষ কোনও উত্তর এলো না। কারণ আগে কখনও তিনি এভাবে ভাবেননি। আমি খুব জোরের সাথে বললাম, ওরা সবাই যোগ করতে পারে। যোগ অঙ্ক শেখাতে ওদের সেই বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কি আমরা কাজে লাগাতে পারি? তিনি নিরুত্তর। এবার তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ক্লাস পরিচালনার ভার আমিই নিলাম। পকেট থেকে ১০, ৫, ২ আর ১ টাকার নোট ও কয়েন বের করলাম। যোগ অঙ্ক করতে পারেনি এমন একজনকে টাকাগুলো দিয়ে গুনতে বললাম। মেয়েটি সুন্দর করে গুনে বলে দিল ১৮ টাকা। এরপর আরও কয়েকজনকে দিলাম সংখ্যা পরিবর্তন করে। সবাই পারল এবং অতি-উৎসাহের সাথে করে দেখাল। শিক্ষককে এবার বললাম, আপনি কি এখনও বলবেন, ওরা যোগ করতে পারে না?

আরেকটি ক্লাসের চিত্র। বিয়োগ অঙ্ক শেখানো চলছে। চিত্র সেই একই। অভিযোগ, ওরা পারে না। আমি এতো চেষ্টা করি, তাও পারে না। আমি আবার জোরের সাথে বললাম, ওরা অবশ্যই বিয়োগ করতে পারে। আবার দায়িত্ব নিলাম ক্লাস পরিচালনার। শিক্ষক দিয়েছিলেন ১৭ থেকে ৫ বিয়োগ করতে। ভাবছিলাম, বাস্তব উপকরণ কী ব্যবহার করা যায়! ক্লাসে বল ছিল অনেকগুলো। ১৭টি বল গুনে আলাদা করলাম। এবার একজনকে ডেকে বলগুলো গুনতে বললাম। ও ঠিক গুনে বলে দিল—১৭টি। এবার বললাম, এখান থেকে ৫টি বল আমাকে দিয়ে দাও। ও গুনে গুনে ৫টি বল দিয়ে দিল। এবার আবার ওকে বাকি বলগুলো গুনতে দিলাম। ও ঠিক বের করে ফেলল—১২টি বল। এবার বললাম, তাহলে ১৭টি বল থেকে ৫টি বল কাউকে দিয়ে দিলে কয়টি বল থাকে? সবাই বুঝতে পারল। পারল, কারণ তারা তো এটা পারেই। সেই পারাটাকেই আমি কাজে লাগাতে চাইলাম। তারপর শিক্ষকের দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, এভাবে করলে তো পারবেই! আমি বললাম, এভাবে করতে কেউ তো মানা করেনি আমাদের?

এ লেখার উদ্দেশ্য শিক্ষকের ভুল ধরা নয়। ভুল আমরা সবাই করি। ভুল করা দোষের নয়। ভুল থেকে শিক্ষা না নেওয়াটা দোষের। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরলাম বিষয়টিকে সহজ করে উপস্থাপনের জন্যে। এও দেখেছি, অনেক শিক্ষক চমৎকারভাবে শিশুদের পড়াচ্ছেন। অনেকের হয়তো পদ্ধতিগত বিশেষ জ্ঞান নেই, কিন্তু ঠিক নিজের মতো একটি উপায় করে নিয়েছেন। সেটিই বেশি দরকার। যারা প্রশিক্ষণ থেকে শিখে এসেই প্রশিক্ষকের শেখানোর মতো করে ক্লাস করতে যান, তারা সব মাটি করেন। নিজে আত্মস্থ না করলে কখনও নিজের মতো করে করা সম্ভব নয়। আর সেটি না করতে পারলে ওই অঙ্ক শেখানোর গল্পই চলতে থাকবে সবখানে।

আমরা যারা শিক্ষা নিয়ে কাজ করি, প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করি; তারা যেন ক্যুরিয়ার সার্ভিসের ভূমিকায় চলে না যাই? শিক্ষকের যেটি ভাল দেখব, সেটি তুলে নিয়ে সারাদেশে চালান করে দেব। নিজে সব জানি আর সেটিই শিক্ষককে শেখাবো; এ-মানসিকতা শিক্ষককে শিখতে সহায়তা করে না বরং শ্রেণিভেদ তৈরি করে। আর শিক্ষক আগে যাও পারতেন, প্রশিক্ষণের পরে একেবারে পঙ্গু হয়ে যান। না পারেন নিজেরটি করতে, না পারেন প্রশিক্ষকেরটি অনুসরণ করতে। শেখানোর সঠিক পদ্ধতি অনুসরণে শিক্ষককে উৎসাহিত করার আগে নিজে জানতে হবে সেটি শিশুদের সাথে কীভাবে কাজ করে। সেই বাস্তব জ্ঞান, মুখস্ত কথা নয়। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে লক্ষ-কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। কাজের কাজ কী হচ্ছে, তা আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। মান নিশ্চিত করতে গেলে অনেক কিছু লাগে। সন্দেহ নেই, অনেক কিছু টাকা দিয়ে কিনতে হয়। কিন্তু যেটি আমার চারপাশে পড়ে আছে, যেটি বিনে পয়সায় পাওয়া যায়, সেটির খবর আমরা কয়জন জানি, এখানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ফ্রেমে আমরা এমনভাবে বন্দি হয়ে গেছি যে, একটু চোখ মেলে তাকাতেও ভুলে গেছি। দেখার দৃষ্টিই হারিয়ে ফেলছি। নিজের ভেতরে তাকাতেও ভুলে যাচ্ছি; নিজের সাথে কথা বলা তো সুদূর পরাহত। আর নিজে না বললে শিশুকে কী করে শেখাব? ওরা কী করে জানবে, বইয়ের বাইরেও অনেককিছু পড়ার আছে, দেখার আছে? টেলিভিশনে নদী দেখে তার ছবি আঁকা নয়, ওদের নিয়ে যেতে হবে নদীর কাছে। তারপর ও নিজেই ঠিক করুক, নদীর ছবি আঁকবে, নাকি সাঁতার কাটবে; নাকি অন্যকিছু। শুধু বই পড়ে নয়, এই নদী-পাহাড়-সাগর আর সাধারণ মানুষের জীবন দেখেই রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন।

সাধারণ মানুষের অসাধারণ চিন্তা, চেতনা আর অভিজ্ঞতা ফিরে আসুক আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়। বন্ধ হোক অন্ধ অনুকরণ। বাইরের স্রোতের সাথে পলিমাটি যেমন এসেছে,

তেমনি এসেছে শ্যাওলা ও কচুরিপানা। বাইরের ভালটা নিই আর খারাপটা ছুঁড়ে ফেলে দিই। আর যে মহামূল্যবান পুরাতনকে বেদরকারি ভেবে অবজ্ঞায় ফেলে দিয়েছি, তাকে আবার কুড়িয়ে নিই। ফিরিয়ে আনি জীবন থেকে শেখার শিক্ষা—যে শিক্ষা মানুষ তৈরি করবে, তোতাপাখি নয়; যে শিক্ষা দেখার দৃষ্টি দেবে, চোখে ঠুলি পড়ার নয়। মানুষের মধ্যে যে পূর্ণত্ব আগে থেকেই বিদ্যমান, তার বিকাশই হোক শিক্ষার উদ্দেশ্য।

লেখক পরিচিতিঃ সুদেব কুমার বিশ্বাস, উন্নয়ন-কর্মী, বর্তমানে জাতিসঙ্ঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার-এ সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

'সমগ্র শিক্ষা অভিযান' এবং বিদ্যালয় শিক্ষার নতুন প্রেক্ষিতের সন্ধানে

প্রকাশনার প্রারম্ভিক সময়পর্ব থেকেই আমরা 'নবদিশা'র পৃষ্ঠায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে প্রতিনিয়ত গৃহীত হওয়া বিভিন্ন নীতিগুলির প্রধান মতাদর্শগত চুম্বকগুলি এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুত্ব বিবেচনা করে তা তুলে ধরা হয়েছে রীতিমতো বিস্তৃত আকারে, যাতে আমাদের পাঠকবৃন্দ বিশেষ করে বাংলাভাষী শিক্ষকবৃন্দ তাদের প্রতিদিনের চর্চার কেন্দ্রে নিয়ে আসতে পারেন দেশের শিক্ষাভাবনা এবং প্রয়োজনমতো নির্মাণ করে নিতে পারেন নিজস্ব মতামত এবং প্রকৃত অর্থে তৈরি হতে পারে একটি সুস্থ চিন্তনের বাতাবরণ।

'সমগ্র শিক্ষা অভিযান' নতুন কোনও শিক্ষানীতি নয়, এটা যেমন সত্যি, অন্যদিকে এই নীতিতে বেশ কিছু বিষয়ে তথাকথিত SSA এবং RMSA-কে সংমিশ্রিত করে পুরো বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে বারো বছরের একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হিসেবে দেখার প্রয়াস রয়েছে । যে মৌলিক বিষয়গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে এই নীতিতে তা নিয়ে আমরা পরবর্তী 'নবদিশা' য় আরও সুবিস্তৃত আলোচনা করার চেষ্টা করব, কিন্তু খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে যদি বলতে হয়, তবে যে প্রধান বিষয়গুলির ওপরে আমাদের আলোকপাত করতেই হবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল;

(ক) বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে Quality Education & Learning Outcome-এর বিভিন্ন দিকগুলিকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে।

(খ) বিদ্যালয় শিক্ষার সামাজিক এবং লিঙ্গগত প্রেক্ষিতে যে বৈষম্যগুলি প্রতিনিয়ত শিক্ষার বৃহত্তর লক্ষ্যগুলিকে নষ্ট করে দেয়, তা যেন খুব বেশি মাত্রায় আরও নির্মম আকার ধারন করতে না পারে তার জন্য এই নীতি দায়বদ্ধ।

(গ) মূল বিদ্যালয় শিক্ষার বিষয়গত প্রেক্ষিতে কারিগরি শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করা এবং প্রয়োজনমতো ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষিত করা।

(ঘ) এর আগেও বলেছি, আবারও জোর দিয়ে বলা দরকার, Quality Education-এর সম্পূর্ণ প্রতর্কটি এখানে খুব ধৈর্য সহকারে তুলে ধরা হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, একটি গুনগত মানের দিক দিয়ে উন্নত শ্রেণিকক্ষ / পাঠঘর কী ধরনের হতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন পরিকল্পনাকারীবৃন্দ এবং বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, 'Quality Education is a comprehensive term that includes learners, teachers, teaching–learning process, learning environment, curriculum pedagogy, learning outcomes, assessment etc.'

(ঙ) সুবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ICT নির্ভর শিখনের প্রক্রিয়া তুলে ধরার ওপরে, যেখানে শুধুমাত্র একটি প্রযুক্তি হিসেবে নয়, ICT আসবে শিখনের মাধ্যম হিসেবে এবং শুধুমাত্র তথাকথিত কিছু বিদ্যালয়েই নয়, এখানে ICT হয়ে উঠবে নতুন চিন্তনের অনন্ত দৌবারিক এবং একটি পরিবর্তনের নতুন উচ্চারণ।

(চ) বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে সমগ্র দেশজুড়ে শিক্ষক-শিক্ষণ নিয়ে অনেক আলোচনা আমরা শুনেছি এবং যার অনেকগুলিই আবর্তিত হয় তথাকথিত B.E.D/D.EL.ED প্রতিষ্ঠানগুলির আইনি স্বীকৃতি, পরিকাঠামো এবং এক্তিয়ার নিয়ে এবং তা নিয়ে মূলধারার গণমাধ্যমে প্রচুর আলোচনা হলেও, যা খুব দুর্ভাগ্যের তা হল এই ধরনের আলোচনাগুলি একেবারেই পুরো পাঠক্রমের গুণগতমানের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোকপাত করে না এবং সেজন্য প্রায় সমস্ত রাজ্যেই খুব দ্রুত এটি রাজনীতির দলীয় চর্চার অঙ্গ হয়ে ওঠে। এই নীতিপত্রে সে জন্য খুব জরুরি ভিত্তিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে শিক্ষক- শিক্ষণের গুনগত মানের বিষয়ে।

(ছ) সর্বোপরি বিশেষভাবে বারেবারে এসেছে SCERT & DIET-এর মধ্য দিয়ে স্থানীয় স্তরে CLRC গুলির আরও ক্ষমতায়ণ।

ছুঁয়ে এলাম মেধা বলয়

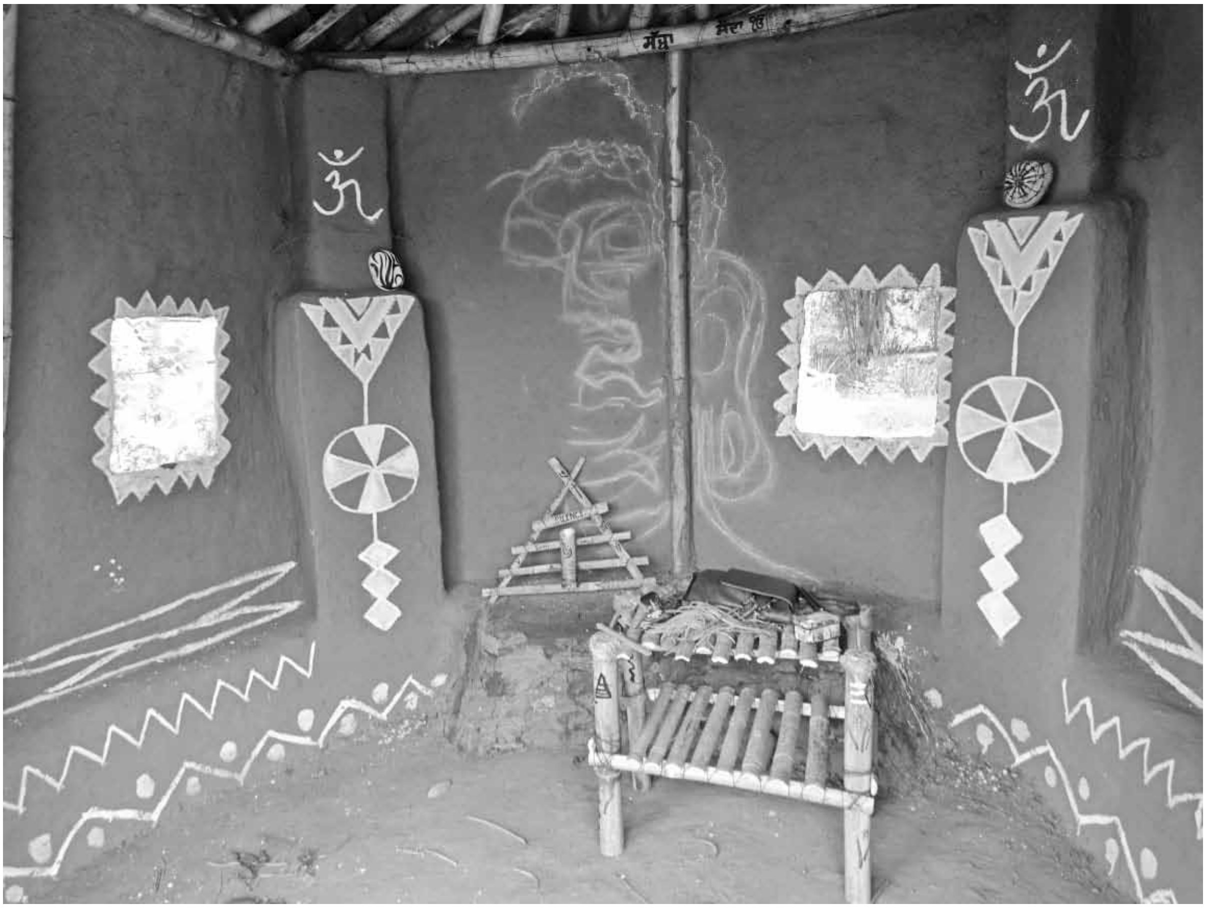

বিগত জুন মাসের মাঝামাঝি সুপরিকল্পিত একটি ভাবনা আমাদের সংস্থায় বিকশিত হতে হতে শুরু করে, ঘুরে দেখতে হবে গোটা দেশের বিকল্প ভাবনার প্রধান আবাসভূমিগুলি। হয়তো তখন থেকেই একটা নীরব পরিবর্তনের পথে হাঁটতে শুরু করেছিল মন আর তার অসীম বিন্যাসে এসেছিল রাজস্থানের 'শিক্ষান্তর' নামক সেই অসামান্য বৈপ্লবিক সংস্থার উদ্যোগের কথা, যেখানে হাবার্ডের সুচর্চিত মেধার গনগনে তাপে রুটি সেঁকে নেন। কোরাপুট অথবা মালকানগিরির বলিরেখা সর্বস্ব মুখের একজন বৃদ্ধা। সেই বৃদ্ধা, যিনি ধরে রেখেছেন হরপ্পার পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার জ্ঞান কাঠামো, যিনি ধরে রেখেছেন বীজের ভিতরে লুকিয়ে থাকা অনন্ত বৃক্ষের দীর্ঘশ্বাস, যিনি প্রতিদিন পেরিয়ে যান আলতামিরার অতন্দ্র রাত্রিগুলি-----

গত চৌঠা অগাস্ট আমাদের প্রথম দেখা হল তাঁর সাথে, সঙ্গ পেলাম এগারোই অগাস্ট পর্যন্ত। প্রতিদিন পেরিয়ে গেলাম উদয়পুরের অলি-গলি, পাকস্থলী আর মুখগহ্বরে উঠে এলো অনার্য মিলেটের স্বাদ।

আসলে শুধুমাত্র শিক্ষা নিয়ে অন্য ধরনের কিছু উদ্যোগ দেখার জন্য যে 'শিক্ষান্তর' যাত্রার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল এমন নয়। আমাদের ভাবনায় ছিল তাদের মতাদর্শগত অবস্থানের সেই সব অনালোকিত এবং অতি আলোকিত চিহ্নগুলি খুঁজে দেখা যেখানে এই বিদ্যালয় এবং কারখানা শোভিত আধুনিকতা পা ফেলতে দেয় না। নবজাগরণ এবং আলোকায়ন মানবসভ্যতার এমন একটি শীর্ষবিন্দু যেখানে মানুষের প্রকৃত ঈশ্বর হয়ে ওঠার শুরু। প্রতিদিন সেই মানবরূপী ঈশ্বরের সাথে শুরু হয় প্রকৃতি আর নিয়তির অনন্ত লড়াই। যে লড়াইয়ে আমাদেরকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে বিদ্যালয় নামক একটি প্রতিষ্ঠান, যা এক সময় মুক্তির বদলে হয়ে উঠল অপার বন্ধন এবং পুঁজি কেন্দ্রীক সভ্যতার প্রধান প্রতিষ্ঠান, আর তার ওপরে আমরা প্রায় নির্বিচারে আরোপ করলাম সমস্ত পবিত্রতা আর দিলাম অপার অনন্ত এবং প্রায় সার্বভৌম জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার সমস্ত ক্ষমতা। যে ক্ষমতাবলে সে শুরু করল বিনাশের আয়োজন, যে আয়োজনে সে পাশে পেল বিশ্বের সমস্ত মেধার আদর আর একে একে নতুন নতুন অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে সে রূপ নিল এক দমনমূলক প্রতিষ্ঠানের।

রাজস্থানের শিক্ষান্তর বিদ্যালয় ব্যবস্থার গ্রাস থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করার সেই প্রতিষ্ঠান, যা De-schooling-এর সরণী বেয়ে পৌঁছে যেতে চায় শিক্ষায়, যা রবীন্দ্রনাথের প্রতিদিনের চর্চায়, জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির সংলাপে, অরবিন্দের নির্মাণে নতুন করে প্রতিবিম্বিত হয় আর সেই প্রতিবিম্বের কাছে সমস্ত নিজের রাজনীতি মেলে ধরতে আমাদের এই উৎপাদন সর্বস্ব সভ্যতার স্নায়ু ছুঁয়ে থাকেন গান্ধী, যিনি তালিমের বয়ানে ধরতে চান শিক্ষার রূপ আমাদের নিরন্তর প্রশ্নের মধ্য দিয়ে কীভাবে শিক্ষান্তরের অর্ধমাত্রা বুনে নেব তার জন্য আমরা সকলেই তৈরি করেছিলাম একগুচ্ছ প্রশ্ন, যা আমরা ভেবেছিলাম হয়তো প্রায় জাতীয় গণমাধ্যমের অতি- দক্ষ সাংবাদিকের মতো ছুঁড়ে দেব শিক্ষান্তরের প্রধান মানুষদের সামনে এবং তাদের সাথে জমে উঠবে তর্ক এবং সেই সাথে পেয়ালার তুফান আর বেলা পড়লে আমরা পৌঁছব নিকটের কোনও গ্রামে যেখানে 'শিক্ষান্তর'-এর কাজ চলে।

চৌঠা অগাস্ট সকাল দশটার একটু পরে যখন কলকাতা থেকে দিল্লীগামী বিমান রাজধানীর মাটি ছুঁল আর প্রবল যানজট পেরিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম creativity Adda নামক উদ্যোগের ছটফটে কিশোরদের কাছে তখন থেকেই যেন বিস্ময়ের শুরু। বিস্তারিত বিবরণে অনুপ্রবিস্ট হওয়ার মতো যথেষ্ট পরিসর নেই তাও যদি একবাক্যে বলি তাহলে যা দাঁড়ায় তা হল যন্ত্র নিয়ে অযান্ত্রিক যাপন। প্রতিদিন প্রায় কোনও শিক্ষকের কর্তৃত্বকারী নজরদারীর বিন্দুমাত্র সান্নিধ্য ছাড়াই ছয় ঘণ্টা ধরে শিশুদের সৃজনের চর্চা চলে, কখনও ক্যামেরায়, কখনও ছবিতে, কখনও রান্নায়, আবার কখনও প্রদর্শন কলায়। আমরা অবাক হয়ে গেলাম নিজেদের কাজ তারা যেভাবে বুঝিয়ে বলল তার আন্তরিকতায় এবং দক্ষতায়।

এখানে দক্ষতা শব্দটির নতুন বিকাশ ঘটাচ্ছেন বন্ধুরা। এই দক্ষতা পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সভ্যতার মুনাফা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা নয়, এখানে দক্ষতা জীবনের নতুন নতুন অর্থ খুঁজে নিয়ে তাকে আরও পরিপূর্ণ করে তোলার জন্য। সারাদিন ধরে এই সব অসামান্য শিশুদের সাথে কাটিয়ে বিকেলে যখন নিজামুদ্দীন স্টেশন থেকে উদয়পুরের পথে রওনা হলাম বুকের মধ্যে লক্ষ লক্ষ কুচকাওয়াজ শুরু হল।

পরের দিন অল্প মেঘলা ছাই রঙের আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে যখন দেখছি বাজার নিজস্ব শহরের মুখ, তখন জানলাম আজ আমাদের প্রধান গন্তব্য স্বরাজ বিশ্ববিদ্যালয়, যা 'শিক্ষান্তর'-এর ভাবনার একটি বাস্তব রূপ এবং তাদের নিজেদের তত্ত্বায়নে একটি Multiversity, যেখানে বহুজাতিক নিয়ন্ত্রিত পুঁজির দ্বারা নির্মিত বয়ানগুলির বিপ্রতীপে দেশ-কাল-সমাজ উন্নয়ন সমস্ত উদ্যোগগুলি নতুন করে ভাবতে শেখানো হয়। আমাদের প্রতিদিনের জীবনের নিভৃত মুহূর্তগুলি কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করেছে বিশ্বায়নের প্রতর্ক দ্বারা, তাই খুলে দেখানো হয় এখানকার 'খোঁজী'-দের সামনে, যাতে স্বরাজ মন্থনে বেরিয়ে তারা খুঁজে নিতে পারে নিজেদের উদ্যোগের চিহ্নগুলি।

দ্বিতীয়বর্ষের 'খোঁজী'-দের সাথে আলোচনার সময় আমরা অপার বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম তাদের ভাবনার গভীরতা, জীবনের দার্শনিক প্রস্থান সম্পর্কে স্বচ্ছ অতলান্ত ধারনা এবং এখান থেকে বেরিয়ে নিজস্ব উদ্যোগ সৃষ্টি সম্পর্কে তাদের চেতনার প্রবাহিত রূপ। নিবিড় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা যারা গলদঘর্ম হয়ে ছুটে বেড়ানোটাকেই ধরে নিয়েছি মানুষের জন্য কাজ করার প্রধান শর্ত আর প্রতিদিন সেটাই করে চলেছি। পৌনপুনিকভাবে ও ভাষায় তাদের কাছে এই বিশ্ববিদ্যালয়, যা কোনও কর্তৃত্বকারী প্রতিষ্ঠানের শিলমোহর বহন করে না অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে, একটি বিরাট প্রহার। যে প্রহারে কালশিটে পড়ে না, অপমান নেই, হিংসা নেই- আছে শুদ্ধতা। সারাদিন ধরে তাই এই একশো শতাংশ UGC-র ন্যূনতম তকমাবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রহৃত হলাম আর শুনলাম তাদের পাঠ, অ-পাঠ আর যাপনের মধ্য দিয়ে কীভাবে সৃষ্টি হয় ways of knowing এর নতুন নতুন দিগন্তগুলি।

আধা পূর্বনির্মিত এবং আধা অনির্মিত একটা পাঠক্রমের মধ্যে তাদের নিয়ত চলাচল কীভাবে দিকচক্রবাল বিস্তার করে, তাই ছিল আমাদের প্রধান জানবার বিষয়। আমাদের স্বরাজ খোঁজীরা অনর্গল জানিয়ে গেলেন তাদের স্বপ্ন-আশা-ভালবাসা-শান্ত বিপ্লবের আগত অনাগত কাহিনিগুলি, যেখানে তাদের প্রাক-স্বরাজ এবং উত্তর-স্বরাজ জীবনের প্রতিটি প্রস্থান বিন্দু একটি বৃত্তে যেন গ্রোথিত হয়ে রয়েছে। আমাদের সারাদিনের এই মন্থন যেন আরেকবার আমাদের সামনে নতুন করে ভারতীয় যুবসমাজের প্রতি বিশ্বাস এবং ভরসা নিয়ে আসলো। আমরা দিনের শেষে যখন উদয়পুরের ঐতিহ্যের পথে ফিরলাম তখন সন্ধ্যা নেমেছে, আর তখনই জানলাম কাল আমাদের যেতে হবে উদয়পুরের সেই অঞ্চলে, যেখানে 'শিক্ষান্তর' সংস্থার কার্যালয়। যদিও তখন জানতাম না যে আরও কত মারাত্মক প্রহার আমাদের জন্য অপেক্ষমান। আমরা যারা তথাকথিত NGO Sector-এর ঘর্মাক্ত কাজ পাগলদের সাথে প্রতিনিয়ত যুঝে চলি আর নিম্ন মেধা-মধ্য মেধার সাথে না চাইলেও লড়াইতে নামতে বাধ্য হই, আমরা যারা তথাকথিত আমলাতন্ত্র খচিত একটা উন্নয়নের ছবিতে মুগ্ধ হয়ে থাকি তাদের সামনে দিনটা এসেছিল একটা আশীর্বাদের মতো।

সেদিন সকাল দশটায় 'শিক্ষান্তর'-এর প্রধান কার্যালয়ে ছিল একটা অতি চেনা গন্ধ যা আমাদের সকলের মনে হয়েছিল খুব পরিচিত এবং এখানে ঢুকতে কোনও তথাকথিত 'যোগ্যতার' প্রয়োজন হয় না। পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সমাজ যখন বিগত দশকের পর দশক ধরে নির্বিচারে এবং প্রায় বিনা বাঁধায় নির্ধারণ করে চলেছে যোগ্য এবং অযোগ্যের সীমানা, তখন প্রতিক্ষণে এই যোগ্যতা নামক মহাকর্তৃত্বকারী ধারনার বিপ্রতীপে বিকল্প রচনার যে প্রয়াস তা শুধু তাকিয়ে দেখার নয়, সেখানে রয়েছে অন্য ধারার অনুশীলনের খন্ড খন্ড কাহিনিগুলি। 'শিক্ষান্তর'-এর বন্ধুরা ঘুরে দেখালেন তাদের নিজস্ব যাপনের পরিসর এবং তাদের ভাবনাবিন্দুগুলি আর কুড়ি মিনিটের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন

এই সমস্ত প্রতিস্পর্ধার অন্যতম প্রধান পুরুষ বন্ধু মনীশ জৈন, সেদিন অগাস্টের ছয়, বেলা এগারটা বেজে পনেরো মিনিট।

আসলে মনীশের academic অথবা professional পরিচয়ের বিশালত্ব যাতে তার অতলান্ত গভীরতাকে ম্লান অথবা অতিক্রম করতে না পারে সে জন্য শুধু এইটুকুই বলব, তিনি হাভার্ডের স্নাতোকোত্তর এবং নব্বই দশকের UNESCO – UNICEF সহ বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। তার প্রবেশ থেকেই যেন একটা অনন্ত মুগ্ধতার বলয়ে আমরা অনুপ্রবেশ করতে শুরু করলাম কিন্তু যেহেতু একটা পূর্ব সতর্কতা ছিলই যে তার মেধার প্রখর দীপ্তি যেন আমাদের আচ্ছন্ন করে না ফেলে সেজন্য প্রতিক্ষণে নিজেদের বুঝিয়ে চলেছিলাম, এই তো সময় ভারতের সব থেকে সুশানিত, সুদক্ষ, সুশিক্ষিত এবং সুপরিকল্পনা ঋদ্ধ বিদ্যালয় ব্যবস্থা, বা আরও সুস্পষ্টভাবে বললে পুঁজি নিয়ন্ত্রিত আধুনিকতা এবং শোষনকামী উৎপাদন ব্যবস্থার পুনরুৎপাদনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে সক্রিয়তা দেশজুড়ে চলছে তার প্রধান তত্ত্ববিদ এবং অনুশীলনকারী মানুষটিকে ক্রমাগত প্রশ্ন করে করে তার তাত্ত্বিক পরিসরটি বুঝে নেওয়ার।

দু'দিন ধরে আপ্রাণ বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম এই মানুষটিকে। মনীশ কথা বলেন এক অত্যাশ্চর্য মগ্নতায়, তার প্রতিটি বাক্যে মিশে থাকে অনাবিল আত্মবিশ্বাস বিপুল দার্শনিক এবং তাত্ত্বিক গভীরতা, তিনি যুক্তি দেন নবজাগরণের তার্কিকদের মতো, তার রাগ যেন উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক কাব্য আন্দোলনের প্রধান পুরুষদের মতো, তিনি অকাতরে প্রতিটি বাক্যে বুনে দেন নিজস্ব চেতনার মণিমুক্তাগুলি, যেখানে অন্ধবিশ্বাসের মতো যে কথা শুনতে লাগে, যেন তার বিরুদ্ধেও বলার থাকে না কিছু। আমাদের দু'দিন মনীশ-যাপনের প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল;

(১) আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামো যখন বিদ্যালয় শিক্ষাকে সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার হিসেবে পরিগণিত করে নতুন বিষয়ীসত্তার নির্মাণ করতে চাইছে তখন এর বিপ্রতীপ ভাবনাগুলি প্রবাহিত হবে কোন পথে?

(২) তথাকথিত National Curriculum Framework 2005-এর দার্শনিক প্রতর্কগুলি কি আদৌ কোনও বিকল্প নির্মাণের সহায়ক?

(৩) তথাকথিত ABL/PBL/EBL -এর নামে যে সমস্ত মহার্ঘ চোলাইগুলি বহুজাতিক সংস্থার আদৃত পাঠক্রমে জায়গা করে নিয়েছে, সেগুলি প্রসঙ্গে আমাদের অবস্থান কী হবে?

এই তিনটি প্রধান প্রশ্নেই মনীশের সপাট নিখাদ উত্তর- "পুঁজিবাদী সমাজে যেখানে আমাদের উন্নয়নের agenda গুলি গৃহীত, নিয়ন্ত্রিত এবং রূপায়িত হয় বহুজাতিক সংস্থার অঙ্গুলিহেলনে, সেখানে কোনও রকম বিকল্পের চিন্তাই বাতুলতা মাত্র। আর সে জন্যই এই পুঁজিনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রকাঠামোর বিরুদ্ধে যদি মননযুদ্ধ পরিচালিত করা না যায় তাহলে Quality Education-এর মোড়কে নোয়াম চমস্কি-কথিত Manufacturing Consent-র ছাড়া আর কিছুই চলবে না।" মনীশের দ্ব্যর্থহীন উচ্চারণে ঝরে পড়ছিলো তীব্র রাগ এবং সমান্তরালে উঠে আসছিল সারা পৃথিবীর সশস্ত্র-নিরস্ত্র বিকল্পগুলির জন্য আবেগ এবং তীব্র ভালবাসা।

আমরা মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম তার Multiversity-র তত্ত্ব এবং ভারতীয় উচ্চশিক্ষার মরা ব্যাঙের শীতল স্যাঁতস্যাঁতে চামড়ার মতো প্রতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে তার জেহাদের পরিকল্পনা। একজন মনুষের প্রবল বিশ্বাস যখন অনুশীলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় তখন তিনিই হয়ে ওঠেন ঈশ্বর।

মনীশের তাত্ত্বিক ভূবনে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র-বিরোধিতা যেন চিরজাগ্রত একটি অনির্বাণ শিখা, যা আমাদের শুদ্ধ করে।

তিনি যখন নঈ তালিম দর্শনের কথা বলেন, শুধু একটা পদ্ধতির কথা বলেন না, তিনি যখন রবীন্দ্রনাথে ডুব দেন তখন শুধুমাত্র কিছু 'মুক্ত' পরিসরে বাউন্ডুলে অভ্যাসের কথা বলেন না, যখন অরবিন্দের কথা বলেন নিছক যোগচর্চার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মেলবন্ধনের কথা বলেন না। মনীশ এবং তার সুযোগ্য, সুশিক্ষিত সুচর্চার অধিকারী তরুণ-তরুণীবৃন্দ তাদের অনুশীলনে বলেন এমন এক শিক্ষাদর্শনের কথা যা সর্বতোভাবে পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের নির্মম সমালোচক এবং এই প্রতিষ্ঠানগত সমস্ত উচ্চারণের বিরুদ্ধে চিরজাগ্রত শুধুমাত্র de-schooling, un-schooling-এর মতো তাত্ত্বিক পরিসর দিয়ে মনীশ এবং শিক্ষান্তরকে বুঝতে হয় তাহলে তাকাতে হবে তার Multiversity তত্ত্বের এবং দর্শনের দিকে।

সেদিন অগাস্টের আট, উদয়পুরের আকাশে মেঘ-রৌদ্রের খেলা আমরা ফিরে আসছি কলকাতায়, জানি ওটা ভিন্ন ধারার যাপন, আমাদের মধ্যমেধা শাসিত এই NGO-Sector-এর সাথে একেবারেই সাযুজ্যপূর্ণ নয়। তবু যখন শুনি আমাদের কলকাতায় ২০১৪ সালের 'হোক কলরব' আন্দোলনের অনুপ্রেরণা এসেছিল গুস্তাভো ইস্তেভার প্রবন্ধ থেকে, যখন শুনি শুধু নদী নিয়ে ভাবার জন্য যুবক-যুবতীরা ভাবছেন River Multiversity, যখন শুনি কলকাতার ত্রিশের চৌকাঠ না পেরনো যুবক-যুবতীরা রাহুল সাংকৃত্যায়নের পথে খুঁজে দেখতে যান লাদাখ আর সে জন্য তারা বারবার বসতে চান 'Travller's University'-র সাথে। যখন শুনি বিষমকটকের রিষিন চক্রবর্ত্তী, সিমলিপালের নৃতত্ত্ব নিয়ে ভাবিত একটি Multiversity সৃজনে বিগত দু'তিন সপ্তাহ ধরে সাইকেল যাত্রায় এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে চলেছেন সিমলিপাল, তখন মনে হয় এখনও ফুরিয়ে যাইনি।

আসুন পাঠক, গোটা দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ Multiversity সৃষ্টি করি। আমাদের De-schooled, un-schooled-এর কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রতিদিন নতুন নতুন Learning Space সৃষ্টি হোক, অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত হোক আলো।

নাটকের মাধ্যমে শিক্ষা-কার্যক্রম

নাটকের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম এমন এক শক্তিশালী আধুনিক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের শ্রেণিকক্ষেই মানবিক-সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সে অবক্ষয় থেকে উত্তরণের বার্তা পৌঁছে দেয়।

নাটকের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত পাঠ্যবইয়ের বাইরে ও পাঠ্যবইয়ের ভিতরের বিষয় নিয়ে অভিনয় ও বিনোদনের মাধ্যমে ৩৫-৪০ মিনিটের প্রয়োজনার পাশাপাশি ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠে মনোযোগী, সচেতনতা ও বিদ্যালয়গামী করা যায়।

স্কুল পড়ুয়া শিশুদের সামনে নীতিবোধ, জলবায়ু পরিবর্তন ও সমসাময়িক সামাজিক বৈষম্যসমূহ বিনোদনের মাধ্যমে তুলে ধরা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে শিশুদের অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া তৈরির মাধ্যমে শিশুদের জ্ঞান ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত বিনোদন ব্যবস্থার বাইরে শিশুদের মধ্যে আনন্দময় পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

যদি প্রকৃতির পথে জীবনটা ভাবিত ও প্রভাবিত হয়, শিশু অপার কৌতূহল-সম্ভাবনার পথ খুঁজে পায়। এটা সহজ ও গভীর। প্রতিদিনের অসংখ্য ঘটনা ও মানুষের পারস্পরিক মিথোস্ক্রিয়া যখন শিশুর সামনে উপস্থাপিত হয়, তখন সে উত্তরণের নতুন একটি পথ খুঁজতে থাকে । এই পথ নির্মাণের ভাবনা তৈরি হয় শিশুর মনোজাগতিক বিকাশের মধ্য দিয়ে।

উপস্থাপন শিল্পকলা একটি মাধ্যম, যা শিশু মনোজগতে কেবলমাত্র দর্শক নয়, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এখানে শিশু তার আনন্দ মিটাবার, তৃষ্ণা মিটাবার পথ পেয়ে যায়, যা জীবনের জন্য বিশেষত্ব। নাটকের মাধ্যমে শিক্ষা পদ্ধতি শিশুর মানসিক পরিবর্তনের সহায়ক হয়ে কাজ করে।

নাটকের মাধ্যমে শিক্ষা-কার্যক্রম মূলত শিশুর মনোজাগতিক বিকাশের বিষয়টি মাথায় রেখে তার কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কোমলমতি শিশুরা বিভিন্ন খেলায় যুক্ত হতে চায়, আনন্দ পেতে চায়, তার কাছে প্রতিনিয়ত শিক্ষাটা জরুরি। এসব বিষয়কে বিবেচনা করে শিশুদের জন্য বিনোদন তথা নাটকের মাধ্যমে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন ও সমসাময়িক বিষয় এবং মানবীয় গুণাবলীর মতো বিয়য়সমূহকে যুক্ত করা যেতে পারে।

নাটকের মাধ্যমে শিক্ষা একটি নতুন মাত্রা, যেখানে মূলত শ্রেণিকক্ষেই মনোনিবেশ সন্নিবেশিত থেকে ছাত্রছাত্রীদের সাথে পারস্পরিক আলাপ-চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সহায়তা প্রদান করে। দেশের টেঁকসই উন্নয়ন কর্মসূচিতে নাটকের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম একটি উদ্ভাবনী প্রায়োগিক উপাদান হিসেবে সুদীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন প্রাইমারি ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে চালানো যেতে পারে। এগুলির প্রয়োগ শিশুর নৈতিক শিক্ষা ও মানবিক উন্নয়ন শিল্প সংস্কৃতি বান্ধব, আগামী প্রজন্ম তৈরিতে সহায়ক হবে। সমন্বিত শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শিশুর তথ্য ও জ্ঞান সমৃদ্ধিতে বিশ্বব্যাপী এটি একটি স্বীকৃত প্রক্রিয়া।

নাটকের মাধ্যমে শিশুর আনন্দময় শিক্ষা একটি গতিময় ধারণা, যার মাধ্যমে শিশু সমসাময়িক এবং অধিকার বিষয়ক সচেতনতা তৈরি, আগ্রহ এবং শিক্ষায় স্বাধীনতা অনুভব করে। সুতরাং এটি এমন একটি অংশগ্রহণমূলক স্বীকৃত আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া যেখানে শিশু তার শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ভয় এবং জড়তা কাটিয়ে সৃজনশীলতার আকাঙ্ক্ষা তৈরি এবং সহজাতভাবে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে ভূমিকা রাখে।

শিক্ষক, অবিভাবক ও ছাত্রছাত্রীসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সমসাময়িক বিষয়সমূহ নির্বাচন করে তা স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে শ্রেণিকক্ষেই নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপনযোগ্য করে তোলা যায় খুব সহজে। এসব বিষয়কে শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়, প্রাণবন্ত ও আগ্রহোদ্দীপক করে তোলার লক্ষ্যে কার্যক্রমে অভিনয়ের পাশাপাশি দৃশ্যমান ছবি, মুখোশ, পাপেট, মূকাভিনয়,শ্যাডোসহ বিভিন্ন বাস্তবধর্মী উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

এই কার্যক্রম প্রক্রিয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্কুলের শিক্ষকেরাও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে শিশুদের সাথে এপদ্ধতি প্রয়োগ করে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে সক্ষম হবেন। বিভিন্ন স্কুলের শ্রেণিকক্ষে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে নাটকের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা যেতে পারে। এই কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন বিষয়কে স্কুলের শিক্ষার্থীদের সামনে দেশীয় নাট্য আঙ্গিকের মাধ্যমে পাঠ্য বইয়ের ছড়া, কবিতা ও গল্প নাটকের সাথে যুক্ত করে অভিনয়ের মাধ্যমে পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরা হয়।

শিক্ষার্থীর মাঝে উদ্দীপনা সৃষ্টি, সৃজনশীলতার উজ্জীবন

এবং জীবনঘনিষ্ঠ জ্ঞান বিতরণ শিশুদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে ভূমিকা রাখে।

সুতরাং আমাদের দেশে নাটকের মাধ্যমে শিক্ষা অনুশীলনকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার সময় এসেছে। গ্রামীণ পর্যায়ে স্কুলগুলিতে রিসোর্স হিসেবে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি। এবিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা খুবই জরুরি। নাটকের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম কার্যক্রমটি পরিচালনার জন্য মাত্র ৩৫-৪০ মিনিট সময়ের প্রয়োজন। অর্থাৎ স্কুলের শ্রেণিকক্ষই এই কার্যক্রমটি পরিচালনার ও সহায়তার জন্য ১-২ জন অভিনেতাই যথেষ্ঠ। শিশুতোষ ও সমসাময়িক বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনায় দেশীয় নাট্য আঙ্গিক, ইম্প্রোভাইজেশনের ব্যবহার শিশুদের সরব উপস্থিতি ও মনোজগতের পরিবর্তন, কখনও কখনও শিশুরা অভিনেতা রূপেই নিজের অজান্তেই নাটকের চরিত্র হয়ে উঠে।

সারা দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য এপদ্ধতি ব্যবহার করা হলে সৃজনশীল মানুষ হিসাবে বর্তমান শিশুরা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

শ্রেণিকক্ষের বাইরের শিক্ষাই প্রকৃত জীবনব্যাপী শিক্ষা

প্রকৃত শিক্ষালাভের জন্য সবসময় নোটবই, গাইডবই বইয়ের থলে আর ব্ল্যাকবোর্ডের সাথে লেগে থাকতে হবে না। শিক্ষা শুধুমাত্র অক্ষর জ্ঞান ও গণিতের সমাধান করা নয়, বা গ্রামারের কিছু নিয়ম জানা নয়।

শিক্ষা একধরনের জীবনব্যাপী সংলাপ পদ্ধতি যেখানে থাকবে প্রশ্ন করা, আলোচনা করা, অনুসন্ধান করা, কোনও প্রচলিত বিষয়ের মধ্যে নতুন অর্থ খুঁজে বের করা এবং প্রতিটি অবস্থায় অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করা ইত্যাদি। শ্রেণিকক্ষে যে শিক্ষাদান করা হয়, অনেক সময় বাস্তব অবস্থার সাথে তার মিল থাকে না। কিন্তু ক্লাসরুমের বাইরের কার্যবলী শ্রেণিকক্ষের চেয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেশি বাড়ায়। শিক্ষার্থীরা তা অনেকদিন মনে রাখতে পারে।

তারা সেখান থেকে সরাসরি যে উদাহরণগুলি দিতে পারে, তা বিদ্যালয় কিংবা শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক শিক্ষায় সম্ভব নয়। শ্রেণি কক্ষের বাইরের ভ্রমন শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, এটি ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বাংলা, ইত্যাদি কারিকুলামের অন্যান্য সব বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এর মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের বাইরে এবং ভেতরে এক ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে এবং প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করা যায়। অনেকের কাছে ইস্কুলের বাইরের ভ্রমন মানে দীর্ঘ বাস ভ্রমন, উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে ঘুরে দেখা নয়। একটা পরিকল্পনা থাকতে হবে কোথায় যাব? কী করব? কেন করব?

শ্রেণিকক্ষের বাঁধা ধরা নিয়ম বা চার দেওয়ালের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার পথ হল, শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা, যাতে তারা তাদের চারপাশের মানুষের সাথে মিশতে পারে, প্রয়োজনে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারে।

শিক্ষার্থীরা কমিউনিটির সদস্যদের সাথে কথা বলে, আলাপ আলোচনা করে কোনও বিষয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য নিতে পারে, সুন্দরভাবে বুঝতে পারে।

যা তার পাঠ্য বিষয়কে আরও সুন্দরভাবে বুঝবার জাত মশলা হিসাবে কাজ করবে। আর এটি যে তাদের মানসিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সৃজনের অনন্ত প্রবাহ এবং অন্য সংস্কৃতির নতুন বিকাশমান ধারা

যারা 'নবদিশা' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক তাদের কাছে বিগত বছরগুলিতে বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি আমাদের বিদ্যালয় ব্যবস্থার মধ্যে যদি নতুন প্রান সঞ্চার করতে হয় তাহলে শুধুমাত্র পাঠচর্চা এবং অঙ্কবিদ্যার মধ্য দিয়ে

এগিয়ে চলাই যথেষ্ট নয়। এছাড়া যদি মুক্ত চিন্তাশীল দেশবাসী তৈরি করতে হয় তাহলে আমাদের এমন একটি বিদ্যালয় সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে, যেখানে কবিতা-গান-স্থানীয় জ্ঞানের পারঙ্গম প্রবাহের সাথে গুণগত মানের সম্পৃক্ত শিক্ষার প্রধান শর্তগুলির মিশেল ঘটবে। এই মহান দার্শনিক প্রত্যয় আজ শুধুমাত্র নবদিশার অক্ষর মানচিত্রে সীমাবদ্ধ নেই, শুধুমাত্র পাঠকবৃন্দের আলোচনায় অথবা প্রবুদ্ধ শিক্ষকবৃন্দের নিভৃত আলাপের মধ্যে সীমায়িত হয়ে নেই, বরঞ্চ এটি প্রবাহিত হয়েছে বেশকিছু গ্রাম পঞ্চায়েতে এবং পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে। এই লেখা যখন প্রস্তুত করছি তখন বাংলার অন্তত ৬-৭ টি জেলার পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধি, আধিকারিক-প্রশাসক এবং প্রবুদ্ধ শিক্ষকদের একাংশ জানালেন, প্রবাহিত হতে শুরু করেছে সৃজনের মুক্ত প্রবাহ। উষরতা যেখানে জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম

সেই পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং ঝাড়খন্ডের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বেশকিছু বিদ্যালয়ে আছড়ে পড়েছে সৃজনের নতুন স্রোতধারা। পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতে, বাঁকুড়ার ওন্দা পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত কাঁটাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতে, বীরভূমের তাঁতিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ন্যূনতম ১৮টি বিদ্যালয়ে শিশু- কিশোর শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের দুর্মর অনুপ্রেরণায় এবং স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে আয়োজন করেছিল সৃজন উৎসব। যেখানে তারা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তুলে ধরেছিল নিজেদের বিভিন্ন প্রদর্শন-পারদর্শীতা। আমরা জেনেছি, বেশকিছু বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে স্থানীয় গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণ ছিল খুব চোখে পড়ার মতো এবং তীব্র উদ্দীপনাময়। আমাদের শিক্ষকবৃন্দ খুব উচ্ছ্বাস নিয়ে জানিয়েছেন, এই ধরনের বিদ্যালয়কেন্দ্রিক সৃজন-উৎসবে যে স্থানীয় সমুদায়ের এতদূর পর্যন্ত অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা যেতে পারে তা আগে তারা অনুমানই করতে পারেননি। এই অনুষ্ঠান শুধু একটি দিনের কাজ হয়ে থাকল না, হয়ে রইল একটি চলমান ধারা। পাশাপাশি আমাদের নবদিশা'র দফতরে এসেছে দক্ষিণ দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার এবং বঙ্গোপসাগর-ছোঁয়া হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সৃজনের নিজস্ব

উচ্চারনের সংবাদ। দিনাজপুরের কুশমুন্ডি আর বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত বিদ্যালয়গুলিতেও ছিল নতুন সৃজনের প্রবাহ বার্তা। সেখানেও দৃশ্যকলা পারঙ্গম শিক্ষকবৃন্দ তাদের নিজস্ব বোধ ও ভাবনা তুলে ধরেছিলেন উৎসব পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। সুন্দরবনের বিদ্যালয়গুলিতে ছিল অনার্য চেতনার মোহময় প্রকাশ, এখানে একসাথে কথা বলে উঠেছিল লবনাম্বু উদ্ভিদ আর সমুদ্রের নোনা হাওয়া। এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে আমরা প্রবল আশাবাদী। সৃজন উৎসব হয়ে উঠতে চলেছে একটি অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক নির্মাণের দ্যোতনাভূমি। আমাদের নতুন প্রজন্মের চেতনায় এমন একটি প্রেক্ষিত যদি রচনা করতে হয়, যেখানে মৃত্তিকার গন্ধে মিশবে জলের নিশ্বাস তাহলে শুরু হবে একটি নতুন নিঃশব্দ প্রতিরোধের প্রবাহ।

'নবদিশা' মনে করে, শিক্ষার অক্ষরবৃত্তের বাইরেও অন্য একটি জীবন রয়েছে, অন্য মাধুর্য রয়েছে যেখানে আমাদের একসাথে অথচ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে হবে।

লেখক পরিচিতিঃ শান্তিদেব চট্টোপাধ্যায়, বাঘমুন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির ভৌগোলিক পরিসীমায় অবস্থিত বিদ্যালয়গুলিতে পরিপ্রেক্ষিতগত প্রাসঙ্গিক শিক্ষা-উদ্যোগের সক্রিয় কর্মী।

বিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী

শিক্ষাদান বা শিক্ষাগ্রহণ শিক্ষাক্রমিক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী, উভয়ের সমন্বয়ে সম্ভব। মূলত শ্রেণি পঠন-পাঠন শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর অন্তর্গত। আর শ্রেণি বহির্ভূত কার্যাবলী যেমন- খেলাধূলা, নাট্যাভিনয় ইত্যাদি বর্তমানে সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী বলে পরিচিত। পূর্বে এইসব কার্যাবলীকে শ্রেণি বহির্ভূত কার্যাবলী (Extra curricular) বলা হত। তখন এসব কার্যাবলীর গুরুত্ব স্বীকৃত ছিল না। বর্তমানে মনে করা হয় যে, শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়নে, শিক্ষার্থী কর্তৃক কিছু অত্যাবশ্যকীয় গুণ অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর পাশাপাশি সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীরও প্রয়োজন আছে।

সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীঃ

তবে যে মূলনীতির উল্লেখ করা হল, এগুলিই সব নয়। এছাড়া, প্রত্যেক ধরনের কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। তবে একথা বলা যায়, এই সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী যদি নিম্নোক্ত নিয়মের উপর ভিত্তি করে রচনা করা যায়, তাহলে সেগুলি সাধারণ পাঠ্যক্রমের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। একথা মনে রাখা দরকার, কেবলমাত্র সহ-শিক্ষাক্রমিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। গতানুগতিক বিষয় কেন্দ্রীক পাঠ্যক্রমের পরিপূরক হিসেবে এগুলি কাজ করে।

সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর প্রকারভেদঃ

১. খেলাধূলা ও শরীরচর্চা বিষয়ক কার্যাবলী: যেমন- ফুটবল, সাঁতার, হা-ডু-ডু, গোল্লা-ছুট ইত্যাদি।
২. সভা ও সম্মেলন বিষয়ক: যেমন- বির্তক প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী, জাতীয় দিবস পালন, স্মরণসভা ইত্যাদি।
৩. বিনোদনমূলক কাজ: যেমন- নাটক, বিচিত্রানুষ্ঠান, আবৃত্তি অনুষ্ঠান, ম্যাজিক শো ইত্যাদি।
৪. সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ: যেমন-বৃক্ষরোপণ অভিযান ইত্যাদি।
৫. কৃষ্টি সংস্কৃতি বিষয়ক: যেমন- দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ, বার্ষিক ম্যাগাজিন রচনা, শিক্ষা সফর ইত্যাদি।

সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর উদ্দেশ্যঃ

(ক) শিক্ষার্থীর চাহিদা ভিত্তিক বিকাশের সুযোগ দেওয়াঃ

শিশুর মধ্যে জন্মগত কতগুলি প্রবণতা থাকে। কোনও শিশু হয়তো খেলাধূলায় আবার কেউ হয়তো অভিনয়ে আগ্রহী। শিক্ষকের কাজ হল সেই প্রবণতাগুলিকে কাজে লাগিয়ে শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো। এক্ষেত্রে সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজগুলি শিক্ষককে সহায়তা করে। তিনি শিশুর প্রবণতাগুলিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে শিক্ষণ পরিচালনা করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীকে স্কুলে টিকে থাকতে সাহায্য করে।

(খ) সামাজিক বৈশিষ্ট্য গঠনে সহায়তাঃ

সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে শিশুর গণতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের উপযোগী মনোভাব গড়ে তোলা যায়। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হল, একদিকে যেমন ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশসাধন, অন্যদিকে তেমন সমাজ-জীবনের উপযোগী করে ব্যক্তিকে প্রস্তুত করে তোলা। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূলকথা হল, মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে ক্ষুণ্ণ না করে পারস্পরিক সহাবস্থান। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের যৌথ কার্যাবলীর (Group activities) মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে এই ধরনের মনোভাব গড়ে ওঠে। খেলাধূলা, যৌথ প্রজেক্ট (Group Project), অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবধারা জাগিয়ে তোলা যায়। তাছাড়া সমাজসেবা ইত্যাদির মাধ্যমেও সহযোগিতা ও সমবেদনামূলক মনোভাব গড়ে তোলা সম্ভব।

(গ) আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলাঃ

সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা যায়। আর এই আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে আসে আত্ম নির্ভরশীলতা। শিশু গৃহপরিবেশে পিতা-মাতার উপর নির্ভরশীল থাকে। ভিন্ন কাজের জন্য বিদ্যালয়ে এসেও তারা যদি সেই শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করে, তাহলে ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনে সে সার্থক মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে পারবে না। তাই বিদ্যালয়ের মধ্যেই সহ-পাঠ্যক্রমিক ব্যবস্থায় তাকে এমন কিছু কাজ দিতে হবে, যাতে তা সমাধানের মধ্যে দিয়ে সে তার আত্মবিশ্বাস (Self confidence) গড়ে তোলার সুযোগ পায়।

(ঘ) সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করাঃ

বিভিন্ন ধরনের সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিমূলক মনোভাবের বিকাশ হয়। এই সহযোগিতা ও সহানুভূতি সমাজ-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ছাত্রসংস্থার সভ্য হিসেবে, খেলার মাঠে, অভিনয়ে সে অন্যান্যদের সঙ্গে সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করবে।

(ঙ) শৃঙ্খলা স্থাপনে সহায়তা প্রদানঃ

সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের সুপরিচালনা করতে পারলে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ অনেক সহজ হয়। খেলার মাঠের নিয়ম-কানুন মেনে, সভার নিয়ম-কানুন অনুশীলন করে বা নিয়ম-কানুন মেনে অন্য যে কোনও ধরনের স্বাধীন কাজ সম্পাদন করে শিশুরা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

(চ) শিক্ষামূলক নির্দেশনা দানের সুবিধাঃ

শিক্ষক যদি সচেতন হন, তাহলে শিক্ষার্থীর কোন বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা বা ঝোঁক আছে, তা নির্ণয় করতে পারেন। এই সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে। এইসব তথ্য তার নিজের পাঠ-পরিকল্পনা রচনায় যেমন সাহায্য করবে, অন্যদিকে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনায় সহায়তা করবে।

(ছ) দৈহিক ও মানসিক বিকাশ সাধনঃ

সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ হয়। খেলাধূলা ইত্যাদির মাধ্যমে হয় দৈহিক বিকাশ, আবার বক্তৃতা, বিতর্ক-সভা ইত্যাদির মাধ্যমে হয় মানসিক বিকাশ।

(জ) অবসর যাপনের শিক্ষাঃ

সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের যে শিক্ষা শিশুরা বিদ্যালয়ে পায়, তা তাকে ভবিষ্যৎ জীবনে সুষ্ঠুভাবে অবসর যাপনে সহায়তা করে। অবসর যাপনের শিক্ষার অভাব আধুনিক যান্ত্রিকতার সময়ে এক বড় সমস্যা। এই সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়ে যায় বিদ্যালয়ে সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের ব্যবস্থা করতে পারলে।

স্কুলে প্রবর্তনযোগ্য সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর তালিকাঃ

১. খেলাধূলা, ক্রীড়ানুষ্ঠান, সাঁতার প্রতিযোগিতা, আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা, স্কাউট, ব্লুবার্ড।
২. বিতর্ক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, নাট্যানুষ্ঠান, বিচিত্রানুষ্ঠান।
৩. উদ্যান রচনা, মৎস চাষ, সবজি বাগান তৈরি।
৪. নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ।
৫. বার্ষিক ম্যাগাজিন, দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ, শিক্ষা সফর, জাতীয় দিবস পালন।

সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর উপযোগিতা/গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তাঃ

১. শারীরিক উন্নয়নঃ

সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা হয়, ফলে শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে এবং তার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়। সুস্থ মন ও সুস্থ দেহ সহাবস্থান করে।

২. জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনঃ

এই কাজগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নতুন এবং অতি প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করতে পারে। কেবল লিখন-পঠনের মধ্যে দিয়েই যে জ্ঞান অর্জিত হয় একথা মনে করা ভুল। বাস্তব পরিবেশের সংস্পর্শে এসে প্রকৃত জীবন-ভিত্তিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই শিশু সত্যিকারের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতাগুলি অর্জন করে থাকে। সহ-পাঠক্রমিক কাজ শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবন থেকে এই প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে সাহায্য করে।

ডিউইর মতে, কোনও প্রকৃত জ্ঞানই সত্যিকার সক্রিয়তার মাধ্যম ছাড়া অর্জন করা যায় না। অর্থাৎ তাঁর ভাষায়, শিখন আসবে কাজ করার মধ্যে দিয়ে। সেই জন্য ডিউইর মতে, এই সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজ শিশুর পাঠ্যসূচির প্রধানতম উপাদান হওয়া উচিত।

৩. পূর্ণতর জীবন অভিজ্ঞতাঃ

এই কাজগুলি শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে এবং পূর্ণভাবে পরিচিত করিয়ে দেয় এবং তার ফলে শিক্ষার্থী তার জীবনকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারে। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবসায় শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ব্যাপকতর ও বৃহত্তর জীবনের কোনও অভিজ্ঞতাই শিক্ষার্থী সেখানে পায় না। তার ফলে তার অভিজ্ঞতা যেমন আংশিক হয়, তেমনই তা সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজগুলি শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে পরিচিত করায় এবং তার অভিজ্ঞতাকে বাস্তবভিত্তিক করে তোলে।

৪. সৃজনমূলক তৃপ্তিলাভ ও বিশেষ শক্তির আবিষ্কারঃ

এই কাজগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সহজাত সৃজন-স্পৃহা তৃপ্তিলাভ করে এবং তার সার্থকতাবোধের ঈপ্সাও আত্ম-প্রতিষ্ঠালাভের প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়। তাছাড়া শিক্ষার্থীর মধ্যে নিহিত বিশেষ বিশেষ শক্তি এবং সম্ভাবনাগুলি এই কাজগুলির মাধ্যমে সামনে আসার সুযোগ পায় এবং শিক্ষক সেই মতো শিক্ষার্থীকে তার ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে যথাযথভাবে পরিচালনা করতে পারেন।

৫. সামাজিক চেতনা ও গুণাবলীর বিকাশঃ

এসব কার্যাবলী শিক্ষার্থীকে দলগতভাবে কাজ করতে অনুপ্রেরিত করে বলে একদিকে যেমন তার মধ্যে সামাজিক চেতনা, সহযোগিতা, স্বার্থহীনতা, সহানুভূতি প্রভৃতি কাঙ্ক্ষিত গুণগুলি জাগিয়ে তোলে, তেমনই তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে জীবন-সমস্যা সমাধানে প্রবৃত্ত করে তার মধ্যে দায়িত্ববোধ, আত্মবিশ্বাস, বিচারশক্তি, চিন্তনশক্তি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিকশিত করে।

৬. দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারঃ

ভ্রমণ, পিকনিক প্রভৃতি কাজগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিভিন্ন লোকের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তার ফলে তার মনের সংকীর্ণতা দুর হয়ে যায় এবং তার দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটে। তাছাড়া দেশভ্রমণ প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থী প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে। তার ফলে শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি ও সৌন্দর্যবোধ বিকশিত হবার সুযোগ পায়।

৭. ব্যক্তিসত্ত্বার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পরম সহায়কঃ

সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজ শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্ত্বার সর্বাঙ্গীণ বিকাশে পরম সহায়ক। তার দেহ-মন, প্রক্ষোভ, সামাজিক চেতনা প্রভৃতি ব্যক্তিসত্ত্বার সমস্ত দিকগুলির সুষ্ঠু বিকাশও এই

কাজগুলির মধ্যে দিয়েই ঘটে। এগুলি একদিকে যেমন তার জ্ঞান আহরণের কার্যকর মাধ্যম, তেমনই অপরদিকে তার মানসিক তৃপ্তির একটি বড় উপকরণ।

সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী সংগঠনের উপায়ঃ

১. বিদ্যালয়ের সাপ্তাহিক রুটিনে একাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট রাখতে হবে।
২. সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ পূর্বাহ্নেই সংগ্রহ করে রাখতে হবে।
৩. শিশুদের আগ্রহ, প্রবণতা মাফিক বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলীর আয়োজন করতে হবে।
৪. নেতা নির্বাচনে ছাত্র/ছাত্রীদের স্বাধীনতা থাকবে।
৫. সহ-শিক্ষাক্রমিক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদানের জন্য একাজের নম্বর বরাদ্দ করা।
৬. সর্বোপরি স্কুলের সার্বিক পরিকল্পনায় উপরোক্ত কাজ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং শিক্ষাকদেরকে বিভিন্ন কার্যাবলীর দায়িত্বে রাখতে হবে।

সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব / উদ্দেশ্য / প্রয়োজনীয়তাঃ

১. সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী ব্যাতীত পূর্ণাঙ্গ ও জীবন-কেন্দ্রীক শিক্ষা সম্ভব নয়।
২. প্রতিটি শিশুর সামগ্রিক বিকাশের জন্য এবং সমাজ চেতনা সৃষ্টির জন্য সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।
৩. পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্য পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।
৪. শিক্ষায় শ্রবণ অপেক্ষা দর্শন বেশি ফলপ্রসূ ও স্থায়ী। তাই শিক্ষা সফর, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা উচিত।
৫. একাজের মাধ্যমে একঘেঁয়েমি দূর হবে।

সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী বাস্তবায়নকালে অনুসৃত নীতিসমূহঃ

সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী বাস্তবায়নকালে নিম্নোক্ত নীতি অনুসরণ করতে হয়-

১. নির্বাচনের স্বাধীনতাঃ

শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের সমাজ জীবনে বাস করে। সুতরাং সমাজ জীবনে নিজের কাজ বা বৃত্তি-নির্বাচনে ব্যক্তির যেমন স্বাধীনতা আছে, বিদ্যালয়েও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী নির্ধারণ করার জন্য ছাত্রদের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। নির্দিষ্ট কোনও কাজ যদি জোর করে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততার উপাদান নষ্ট হয়ে যাবে। ছাত্রদের গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে রেখে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী নির্বাচন করা দরকার।

২. সময়সূচির অন্তর্ভুক্তিঃ

সহ-শিক্ষাক্রমিক কাজগুলিকে বিদ্যালয়ের কাজ চলাকালীন পরিচালনা করতে হবে। তা না হলে সকলে এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। বিদ্যালয়ের সময় তালিকার মধ্যে এই ধরনের কাজ করার জন্য সময় নির্দিষ্ট রাখা দরকার। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্বও বাড়ে।

৩. শিক্ষক নির্বাচনঃ

সহ-শিক্ষাক্রমিক কাজ পরিচালনা করার জন্য যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে। শিক্ষকদের যোগ্যতা সঠিকভাবে নিরূপণ করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের কাজের ভার ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের উপর দিতে হবে।

৪. নেতৃত্বের মর্যাদাঃ

এইসব কাজের মআধ্যমে যে নেতৃত্বের বিকাশ হয় তাকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে। বিভিন্ন কাজের জন্য নেতা নির্বাচন, বিশেষভাবে যাদের পারদর্শিতা রয়েছে, এক্ষেত্রে তাদের দিকে নজর দিতে হবে। কাজ পরিচালনার এই নির্বাচিত নেতাদের নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা দিতে হবে।

৫. ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের দায়িত্বঃ

যে শিক্ষকের উপর সহ-শিক্ষাক্রমিক কাজ পরিচালনা করার ভার থাকবে, তিনি যেন নিজের মতামত ছাত্রদের ওপর জোর করে চাপিয়ে না দেন। কাজ নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি ছাত্রদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেবেন এবং তা পরিচালনার সময়ে একজন উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের উৎসাহদানের জন্যে শিক্ষক মাঝেমাঝে এইসব কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণও করবেন।

৬. বাধ্যতামূলক করাঃ

প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে বাধ্যতামূলকভাবে সহ-শিক্ষাক্রমিক কাজে যোগ দিতে পারে, তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কারণ, বর্তমানে এগুলিকে শিক্ষাক্রমের অংশ হিসেবে ধরা হয়। এই অংশের শিক্ষা যদি না হয়, শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে একথা বলা যায় না। অবশ্য প্রত্যেকে যে এইরকমভাবে কাজে যোগ দেবে বা একই পারদর্শিতা দেখাবে, তা কখনও আশা করা যায় না। তবে এইসব কাজে যোগদানের মাধ্যমে নিজেদের বিকশিত করার অনেক সুযোগ তারা পায়। এই সুযোগ থেকে কাউকে বঞ্চিত করা চলবে না।

৭. নির্বাচিত কয়েকটি কাজ গ্রহণঃ

এই ধরনের কাজ বিদ্যালয়ে প্রচলন করার সময় অনেকগুলি কাজ একসঙ্গে হাতে নিলে অসুবিধা হবে। তাতে শিক্ষকদের ওপর অনেক চাপ এসে পড়বে। কিন্তু প্রথম স্তরে যদি নির্বাচিত কয়েকটি কাজ নেওয়া যায় এবং তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়, তাহলে অনেক ভাল ফল পাওয়া যাবে। অনেক কিছু একসঙ্গে করতে গিয়ে যদি তা সঠিকভাবে পরিচালনা না করা যায়, তাহলে তার থেকে ভাল ফল পাওয়া যাবে না। সুতরাং এই ধরনের কাজের প্রবর্তন করতে হলে প্রথমে কম কাজ দিয়ে শুরু করে ধীরে ধীরে কাজ বাড়াতে হবে।

৮. কাজের উপকরণঃ

প্রত্যেক ধরনের কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয়

উপকরণ, অর্থ ইত্যাদি বরাদ্দ করতে হবে। প্রয়োজন হলে শিক্ষামূলক আসর বা ক্লাবের জন্য আলাদা ঘরও ছেড়ে দিতে হবে। এই ধরনের কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে ছাত্ররা যদি প্রতি পদে বাধা পায়, তাহলে তারা ক্রমে নিরুৎসাহী হয়ে পড়বে।

৯. কাজের মূল্যায়নঃ

প্রত্যেক রকম কাজের জন্য আলাদা আলাদা রেকর্ড-কার্ড থাকবে; যার দ্বারা ছাত্রদের পারদর্শিতার মূল্যায়ন করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক কাজেরও মূল্যায়ন করা দরকার। কোনও কাজ বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যকে কতটা সার্থক করে তুলছে তাও বিচার করে দেখা দরকার। কারণ এর উপর নির্ভর করছে কোন কাজটা রাখা হবে, কোনটাকে বাদ দিতে হবে। যে সব কাজের দ্বারা শিক্ষার্থীদের কোনও উন্নতি হয় না, এক্ষেত্রে সেগুলির চর্চা করার কোনও প্রয়োজন নেই।

১০. অভিভাবকের অবগতির জন্য ব্যবস্থাঃ

সবশেষে বিদ্যালয়ে কী কী ধরনের সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর অনুশীলন করা হয় এবং ছাত্রছাত্রীরা কী ধরনের পারদর্শিতা সেখানে দেখাচ্ছে, এসম্পর্কে অভিভাবক এবং পিতা-মাতার অবগতি একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের অবগতির ব্যবস্থাও করতে হবে।

পরিশেষে, আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর শব্দের সহ-শব্দ বাদ দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন। অর্থাৎ খেলাধূলা, নাট্যাভিনয় ইত্যাদি কার্যাবলীও শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর মতই গুরুত্বপূর্ণ। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "হাওয়া খেলে পেট ভরে না, কিন্তু খাওয়া হজমের জন্য হাওয়ার প্রয়োজন।" উক্ত উক্তিতে শিক্ষাক্রমিক ও সহ-শিক্ষাক্রমিক উভয় কার্যাবলীই যে অত্যাবশ্যক, তার ইঙ্গিত রয়েছে।

বিদ্যালয়ে স্থানীয় দক্ষ ব্যক্তিদের ব্যবহার

আপনার আশেপাশে আপনি এমন মানুষ খুঁজে পাবেন, বিভিন্ন বিষয়ে যাদের দক্ষতা রয়েছে, আপনি প্রাকৃতিক সম্পদের ও বিস্তৃত ভান্ডার খুঁজে পাবেন। এটি আপনাকে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে সাহায্য করবে।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি গণিতে টাকা বা পরিমাণ নিয়ে কাজ করেন, তবে আপনি আপনার শ্রেণিকক্ষে বাজারের ব্যবসায়ী বা বস্ত্র প্রস্তুতকারী ব্যক্তিদের নিয়ে এসে তারা তাদের কাজে কীভাবে গণিতের ব্যবহার করেন তা ব্যাখ্যা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। কলাবিদ্যায় আপনি যদি নকশা, গান, নৃত্য , নাটক, আবৃত্তি, হাতের বিভিন্ন কলা-কৌশল শেখাতে চান তাহলে স্থানীয় ওই শিল্পীদের স্কুলে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

শিক্ষার্থীদের তাদের পরিবেশের সমৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুভব করতে উদ্দীপ্ত করবে এবং হয়তো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণভাবে শিক্ষার্থীদের শেখার ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অভিমুখে কাজ করবে, যা হলে বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে শেখা আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে সাংস্কৃতিক শিক্ষার ভূমিকা

আমাদের সাধারণ শিক্ষার পাঠ্যক্রমে এসব ললিতকলা বা পারফর্মিং আর্টসকে যুক্ত করতে পারলে তা কী ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পারে? 'সাংস্কৃতিক শিক্ষা' কথাটা অর্থ দ্ব্যর্থবোধক। কারণ সংস্কৃতির অর্থ শুধু নৃত্য-সঙ্গীত-ললিত কলা নয়, ব্যাপক একটি জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবন ধারাই হল তার সংস্কৃতি। সেই অর্থে জীবন সংক্রান্ত সকল শিক্ষাই বস্তুত সাংস্কৃতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। আমরা সাধারণত নৃত্য-সঙ্গীত-নাটক-আবৃত্তি ইত্যাদির অনুষ্ঠানকে সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান বলে থাকি বলে এই বিভ্রান্তি তৈরি হয় এবং আমাদের দেশের অনেক বিদগ্ধজনও এজাতীয় বিভ্রান্তিতে ভোগেন। বস্তুত সংস্কৃতি শব্দটি নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রচুর বিভ্রান্তি রয়েছে।

আমাদের প্রচলিত যে শিক্ষা পদ্ধতি, সে বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার গলদ অনেক এবং তা কেবল পদ্ধতিগত প্রশ্নে নয়, মূল বিষয়গত প্রশ্নেও। পদ্ধতি হল উপায় বা পন্থা, মূল বিষয় হল শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য কী, কেন আমরা শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করব, সেটা বস্তুত মূল বিষয় বা রণনীতির অন্তর্গত। পদ্ধতি হল রণকৌশল।আবার সঠিক পদ্ধতি প্রণয়ন নির্ভর করে সঠিক লক্ষ্য স্থির করার উপর। জীবিকা নির্বাহ করাই আমাদের শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছে, আলোকিত মানুষ তৈরি করার কোনও আকাঙ্ক্ষা আমাদের তেমনভাবে ভাবিত করে না। আমরা আজ একটি পণ্যভোগী সমাজের বাসিন্দা এবং অনেক কিছুর মতো শিক্ষাও একটি মহার্ঘ্য পণ্যে পরিণত হয়ে গেছে। তাই অর্জনের পরিবর্তে শিক্ষা আজ চড়া দামে কিনতে হয় এবং একই কারণে শিক্ষাকে কেবল ব্যবসায়িক বিনিয়োগ হিসাবে দেখা হচ্ছে। তাই আজকের অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের চড়া দামে চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, কারিগর, হিসাববিদ্-এর সনদ ক্রয় করে দিচ্ছে, তাদের সন্তান মানুষ হচ্ছে কিনা সেব্যাপারে তারা নিস্পৃহ। আমরা সকলে জানি, সদ্যজাত একটি শিশুর সাথে নবজাতক পশু-শাবকের কোনও পার্থক্য থাকে না। বস্তুত প্ররথমত পারিবারিক, অতঃপর সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা একটি শিশুকে ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণ মানুষ করে তোলে। আমাদের প্রয়াত কথা সাহিত্যিক, আবুল ফজল লিখেছিলেন তরুলতা সহজে তরুলতা, পশুপাখি জন্মেই পশুপাখি, মানুষ অতি কষ্টে মানুষ। অর্থাৎ জন্ম নিলেই মানুষ মানুষ হয় না, তাকে তিলে তিলে মানুষ হয়ে ওঠতে হয়। এই মানুষ হয়ে ওঠা একটি প্রক্রিয়া, আর এই প্রক্রিয়ার নামই হল শিক্ষা। বলা বাহুল্য, এশিক্ষা কেবল বই-পুস্তক-পুঁথি পাঠের মাধ্যমে লিখতে, পড়তে আর অঙ্ক কষতে জেনে অর্জন করা যায় না।

একজন শিক্ষিত মানুষ বস্তুত একজন আলোকিত মানুষ। আলো আর আঁধার যেমন এক সাথে থাকতে পারে না, তেমনি একজন আলোকিত মানুষ কখনও অন্ধকারের সঙ্গে আপোষ করতে পারে না। শিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে, আর আলোকিত মানুষের হৃদয়ে মানবিক গুণাবলীর বিকশিত শতদল তাকে সত্যিকার একজন মানুষে পরিণত করে। স্বেচ্ছায় বা সজ্ঞানে তার পক্ষে কোনও অন্যায় করা কিংবা কখনও অন্যায়ের সঙ্গে আপস করা সম্ভব হবে না। অথচ আমরা আজ অবাক বিস্ময়ে কী দেখি! আমাদের রাষ্ট্রে বা সমাজের সবচেয়ে বড় দুর্নীতি কিংবা অপকর্মে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বোচ্চ শিক্ষাধারীদের সংখ্যাই বেশি। অথচ সঠিক অর্থে একজন শিক্ষিত লোক কখনও মিথ্যা বলতে পারে না, পারে না ঘুষ খেতে, দুর্নীতি করতে, সাধারণ মানুষের টাকা আত্মসাৎ করতে - যা আমাদের দেশে একটি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এরজন্য দায়ী আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার গোঁড়ার গলদ। অর্থ উপার্জনই যেখানে আমাদের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে মানুষ হয়ে ওঠার তাগিদ কোথায়? কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? প্রথমত, আমরা আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারিনি কিংবা ভুল লক্ষ্য নির্ধারণ করে বসে আছি। দ্বিতীয়ত, গোটা শিক্ষাটাকেই আমরা কেবল কারিগরি জ্ঞানের মতো মনে করি। কী করলে কী হবে, এটাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের জানান দিচ্ছে, কেন হবে? অর্থাৎ শিক্ষার পেছনের দর্শন, তার কার্যকারণ সম্পর্ক, আমাদের ছাত্রছাত্রীদের জানানো হয় না। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের সন্তানদের প্রথম শিক্ষালয় কিন্তু আমাদের স্ব স্ব পরিবার। কোনও পরিবারে যখন নতুন সন্তান আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন সম্ভাব্য সন্তানদের হবু মা-দাদী-ঠাকুমারা অত্যন্ত যত্নে জামা-কাপড়-কাঁথা সেলাই করে রাখে। জন্মের পর এসকল জামা-কাপড় সদ্যজাত সন্তানকে পড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনাটি কিন্তু আমরা সকলেই দেখি। কিন্তু আমরা যেটা দেখি না, তা হল, যে পরিবারে সন্তানটি জন্ম নিল সে পরিবারের ভাবনা-চিন্তা-আচার-আচরণের একটি অদৃশ্য অবয়ব ও তার

জন্য তৈরি হয়ে থাকে। তাকে সেটা ঘটা করে পড়িয়ে দিতে হয় না। আস্তে আস্তে সেই সন্তানটি নিজেই পরিধেয় বস্ত্রের মতো সেই অবয়বে প্রবেশ করে। সেই অবয়বটা তৈরি হয় একান্ত পারিবারিক সংস্কৃতি, তথা সে পরিবারের লোকজন কীভাবে কথা বলে, কোন ভাষায় কথা বলে, পরস্পরের সাথে কেমন সম্পর্ক ও কেমন আচরণ করে, বদমেজাজি ঝগড়াটে, নাকি শান্তিপ্রিয়, প্রতিবেশীদের সাথে তাদের সম্পর্ক ইত্যাদির উপর। তাহলে সন্তানকে কেবল ভাল স্কুলে পাঠিয়ে আমরা যারা স্বস্তি পাই, আমার ছেলে মানুষ হবে, সে প্রত্যাশাটা ভুল। পারিবারিক পরিবেশ ছাড়িয়ে ক্রমে এই সন্তানটি প্রবেশ করে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে। আমাদের আরও স্মরণে রাখতে হবে, একটি অসুস্থ সমাজে বসবাস করে একজন ছেলে সুশিক্ষিত হবে, তা অসম্ভব না হলেও অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই জন্য সামগ্রিকভাবে সমাজকে সুস্থ রাখার প্রক্রিয়ায় আমাদের সামিল হতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আরেকটি গলদ হল, শিক্ষার পদ্ধতি। যে পদ্ধতিতে যে ছাত্র যত বেশি মুখস্ত করতে পারে, সে তত মেধাবী বলে চিহ্নিত হয়। ভাল শিক্ষা লাভ নয়, পরীক্ষার ফল ভাল হওয়া চাই - এই প্রতিযোগিতা থেকে অভিভাবকদের মুক্ত করার মানসে নতুন গ্রেড পদ্ধতি চালু করেও কী সেখান থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে? আমার মনে হয়, না। আমাদের শিক্ষার সাথে আনন্দের কোনও যোগ নেই। বছরে একটি ক্রীড়ানুষ্ঠান মোটেও যথেষ্ট নয়। লেখাপড়া করছে। আমাদের শিশুরা, কিন্তু সকালে কোনও কারণে স্কুলে যেতে না হলে বেশি খুশি হয়। ছোটবেলায় বৃষ্টির বায়নায় কত স্কুল কামাই করেছি। আর স্কুলে গেলে অধীর আগ্রহে সময় গোনা, কখন বাজবে ছুটির ঘন্টা। সে ঘন্টা যখন বেজে ওঠে, তখন ছেলে-মেয়েরা হুড়মুড় করে যেভাবে ভোঁ-দৌড় দেয়, মনে হয় তারা স্কুল থেকে না, যেন কোনও কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেল। এই জায়গায়ও আমাদের ভাবতে হবে। শিক্ষার বিষয়বস্তুর সাথে শিক্ষা পদ্ধতিকে এমন করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণের সময়ে ক্লান্তির পরিবর্তে আনন্দবোধ করে। কারণ আমরা সকলে জানি, খাদ্য যতই পুষ্টিকর হোক, তার স্বাদ ভাল না হলে তা কেউ খেতে চায় না এবং সেই খাদ্য দুস্পাচ্যও বটে। তাই আমাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষাকে যতদিন না রুচিকর খাদ্যে পরিণত করতে পারব, ততদিন তা যেমন তারা গিলতে চাইবে না, আবার গিললেও তা আমাদের সন্তানদের হজম হবে না। এখানেই আসে আমাদের শিক্ষা পাঠ্যক্রমে চারুকলার অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি।

আমরা জানি, জ্ঞানের সব বিষয় কিন্তু সহজবোধ্য নয়। অনেক নীরস ও কঠিন বিষয়ও আমাদের ছেলে-মেয়েদের আত্মস্থ করতে হয়। কিন্তু আমরা চেষ্টা করলে সেই দুর্বোধ্য ও নীরস বিষয়টিকে রসালো করে পরিবেশন করতে পারি। আমাদের সাধারণ পাঠ্যক্রমে যদি বিভিন্ন বিষয় যেমন, অঙ্ক, ইংরেজি, বাংলা ও বিজ্ঞানের সাথে নৃত্য-সঙ্গীত, আবৃতি, অভিনয়, বিতর্ক প্রতিযোগিতার মতো বিষয়গুলিকে যুক্ত করি, তাহলে শিক্ষার গুরুগম্ভীর ও ক্লান্তিকর পরিবেশটা শিক্ষার্থীদের কাছে সহজেই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠবে। তাছাড়া চারুকলা চর্চার সাথে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের প্রশ্নটিও জড়িত। মানুষের উপর বিশেষভাবে সুর ও সঙ্গীতের প্রভাব অত্যন্ত সর্বগ্রাসী। একটি সঙ্গীত মানুষকে যত তাড়াতাড়ি প্রভাবিত, উদ্বুদ্ধ এবং আলোকিত করতে পারে, ক্লাসরুমে শিক্ষকের ক'টা বক্তৃতা তা করতে পারবে, আমি জানি না। আমাদের বাউল সাধক লালনের কালজয়ী গান- 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে——-' যে ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা তা কখনই করতে পারবে না। সুর-সঙ্গীতের যে শক্তি, তাকে কীভাবে আমাদের সাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় কাজে লাগানো যায়, যত শীঘ্র তা ভাবা যায়, ততই মঙ্গল।

নবদিশার বইয়ের টেবিলে

খুব সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের পড়ার টেবিলে যে সমস্ত বই এসে পৌঁছেছে তার মধ্যে যে বইটি আমাদের মনে হয়েছে আলাদা করে আলোচনার দাবি রাখতে পারে, সেটি লিখেছেন অধ্যাপক এবং দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে নদী নিয়ে ভবিত মাননীয় কল্যাণ রুদ্র মহাশয়। বইটির নাম ‘পশ্চিমবঙ্গের জলসম্পদ সংকটের উৎস সন্ধানে’। এই গ্রন্থ প্রকাশ করেছে সাহিত্য সংসদ। পুরো বইটিতে রয়েছে পাঁচটি অধ্যায় এবং একটির সঙ্গে অন্য অধ্যায় গভীরভাবে সম্পর্কিত।

প্রথম অধ্যায়ে লেখক আলোচনা করেছেন, বৃহত্তর আকারে আমাদের রাজ্যের জলসম্পদের সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিয়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুনিবিড়ভাবে আলোচিত হয়েছে জল ও সমগ্র বাস্তুতন্ত্র এবং সভ্যতার সঙ্গে তার সম্পর্ক। তৃতীয় অধ্যায়ে উঠে এসেছে গোটা দেশের জলসম্পদ। চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি খুব সুনিপুন অনুপুঙ্খময়তায় তুলে ধরেছেন বাংলার জলসম্পদের ছবি। আর পঞ্চম অধ্যায়ে জায়গা পেয়েছে জলসংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা। এই বইয়ে তিনি সংযুক্ত করেছেন একটি পরিশিষ্ট অধ্যায়, যেখানে তুলে ধরা হয়েছে বাংলার বিভিন্ন জেলার জলের চালচিত্র। বিষয়ের গভীরতা যেহেতু অতলান্ত, সেজন্য তা ঠিক যে ধরনের ভাষাগত মাধুর্য এবং প্রাঞ্জলতা দাবি করে ঠিক সেই ভাষাই তাঁর লিখনে নিয়ে এসেছেন অসামান্য এই গবেষক। যখন গোটা পৃথিবীজুড়ে সমাজবিজ্ঞানী, বাস্তুতন্ত্র বিশেষজ্ঞ এমনকি রাজনীতির পেশাদাররা আমাদের সাবধানবাণী শুনিয়ে চলেছেন। যখন আগামী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইস্যু হতে চলেছে জল, তখন লেখকের এই বই প্রতিরোধের একটি জরুরি অস্ত্র হয়ে থাকল।

বিখ্যাত চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষা

জে.পি.নায়েক

(১৯০৭ -১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ)

এ.আর.কামাত-এর লেখা ইংরেজি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

ভারতীয় শিক্ষা জগতে দাপিয়ে বেড়িয়েছিলেন জে.পি.নায়েক– চার দশকেরও বেশি সময় ধরে। মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে শিক্ষাদর্শে গান্ধীবাদী মনোভাব; গ্রামেগঞ্জে বুনিয়াদি শিক্ষা নিয়ে কাজকর্ম; প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা, পরিচালনা করা; পরবর্তীকালে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার পুর্নগঠন ও সংস্কার নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা, রূপায়ণ করাই ছিল জে পি.নায়েকের জীবন ধারা। ভারতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে এমন কিছু ছিল না, যা তাঁর অজানা ছিল। স্বাধীনোত্তর ভারতের বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে। যেমন– (NCERT) এন.সি.ই.আর.টি (শিক্ষা আর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত জাতীয় পর্ষদ), জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও পরিচালন সংস্থা এন.আই.ই.পি. (N.I.E.P), পুনের I.I.T যেখানে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করা যায়। এছাড়া গ্রামীণ সমাজ উন্নয়ন নিয়ে পড়াশোনার জন্য কোলাপুরে একটি সংস্থা তৈরি করেন জে.পি.নায়েক। ১৯৬৪ সালে প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। জে.পি.নায়েক এই কমিশনের সদস্য-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষা নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা ধরা রয়েছে তাঁর নানা লেখায়। যেমন-

> **গ্রামেগঞ্জে বুনিয়াদি শিক্ষা নিয়ে কাজকর্ম; প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা, পরিচালনা করা; পরবর্তীকালে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার পুর্নগঠন ও সংস্কার নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা, রূপায়ণ করাই ছিল জে. পি. নায়েকের জীবন ধারা।**

১) দুই খণ্ডের আধুনিক ভারতের শিক্ষার ইতিহাস, যেখানে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কালানুক্রম ও সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য দেওয়া আছে।

২) গান্ধীজির বুনিয়াদ শিক্ষা ও তার রূপায়ণ নিয়ে লেখা, যেখানে কর্মশিক্ষা ও হালের SUPW (সামাজিকভাবে উপযোগী উৎপাদনমূলক কাজ)-এর কথা বলা আছে;

৩) জনশিক্ষা সংক্রান্ত নানা লেখা যেখানে বুনিয়াদি শিক্ষার সর্বজনীনতার প্রবর্তন করেছেন, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের কথা বলেছেন। বয়স্ক শিক্ষা, প্রথা-বর্হিভূত শিক্ষা ও অবিরাম বা কনটিনিউয়িং শিক্ষাক্রমের কথা বলেছেন;

৪) শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও পরিচালনা নিয়ে বহু লেখা রয়েছে।

৫) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট আকারে লেখা ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুর্নগঠনের লক্ষ্যে এক মহান নকশার অবতারণা করা।

জীবনের শেষ দিকে তাঁর লেখালেখির বিষয় হয়ে ওঠে সমাজ ও শিক্ষার মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক। ততদিনে তাঁর ভাবনা চিন্তায় ঘটে গেছে এক বিপুল বদল। শুরুর দিকে তাঁর শিক্ষা চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষাক্রম আর তাঁর নিজের গ্রামেগঞ্জে গরীবগুর্বো মানুষদের সঙ্গে শিক্ষা নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা। সেই প্রভাব আমরা দেখতে পাই জে পি নায়েকের নানা লেখায়, এমনকি ১৯৬৪-৬৬-র শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনেও সেই প্রভাব দেখা যায়। তিনি জনশিক্ষার কথা বলতে গিয়ে দাবি করেছেন, বুনিয়াদি শিক্ষার সর্বজনীনতাকে (নিদেনপক্ষে ৬-১১ বছর বয়সীদের জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের কথা বলেছেন)। সর্বজনীন স্কুল শিক্ষার পাশাপাশি চালু করতে হবে এমন এক প্রথা-বর্হিভূত শিক্ষাব্যবস্থা যার বহুমুখী প্রবেশ থাকবে। এই শিক্ষাব্যবস্থা হবে আংশিক সময়ের জন্য। এখানকার পাঠক্রম ক্রমানুসারী হবে না। তত্ত্বগতভাবে এত নিখুঁত শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার সময় সফল হল না। ধুমধাম করে জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির সূচনা হলেও কিছুদিন পর থেকে কর্মসূচির পথ চলা খোঁড়াতে শুরু করল। জে পি.নায়েক বিরক্তির সঙ্গে এর সমালোচনা করলেন। তিনি এই বলে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার তিরস্কার করলেন, যে এব্যবস্থা চিরকালই "শ্রেণি" শিক্ষার পক্ষে কাজ করেছে। কোনও দিনই এই ব্যবস্থা জনগণের পক্ষে দাঁড়ায়নি। তিনি সর্বজনীন বুনিয়াদি শিক্ষা আর বয়স্ক শিক্ষার লক্ষ্যে এক জন-আন্দোলনের আহ্বান জানালেন। ভারতীয় আর্থ-সামাজিক গঠনের নিদারুণ দারিদ্র, উপার্জনের ক্ষেত্রে যে ভয়ানক অসাম্য, ধন ও রাজনৌতিক ক্ষমতার অসম বিন্যাস জে পি নায়েকের স্বপ্ন সাকার হতে দিল না। তবে তাঁর উদ্যোগে পুনের শিক্ষাকেন্দ্রীক প্রশিক্ষণ সংস্থার হাত ধরে গ্রামীণ এলাকায় বেশ কিছু সফল বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা সম্ভব হয়। ১৯৬০

সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর তিনি সকল স্তরের শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও পরিচালনায় গুণগত উন্নতির ভাবনা-চিন্তা শুরু করেন। আর এই সুবাদে N..I.E.P.A (জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা ও পরিচালনা কেন্দ্র) স্থাপিত হয়। ভারতীয় শিক্ষার পুর্নগঠন, শিক্ষার সঙ্গে সমাজের যোগ, শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক জে.পি. নায়েককে ভাবিয়েছে। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে তাঁর এই চিন্তাভাবনার কথা জানা যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে থাকাকালীন তো বটেই এবং তার পরেও ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা যে স্বায়ত্ত লাভ করেনি সেটা জে. পি.নায়েক বারবার দেখিয়েছেন। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে ফেলে তৈরি করতে হবে একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা, যা ভারতীয় সমাজের পরিবর্তন সাধন করবে। এই শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হবে সামাজিক ও জাতীয় ঐক্য সাধন, উৎপাদন বৃদ্ধি, গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করা ও আধুনিকতার প্রসার ঘটানো, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-মনস্কতার প্রসার এবং যথাযথ সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রসার। উপরোক্ত লক্ষ্যগুলিকে মাথায় রেখে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের মাধ্যমে পেশ করা হল জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার এক মহতী নকশা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পশ্চিমী সমাজ বিজ্ঞানীদের ধারা অনুসারে জে পি নায়েকও মনে করতেন যে, শিক্ষা হল সমাজ বদলের হাতিয়ার। ভারতীয় সমাজে আমূল পরিবর্তন শিক্ষার হাত ধরে আসবে।

এই শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হবে সামাজিক ও জাতীয় ঐক্য সাধন, উৎপাদন বৃদ্ধি, গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করা ও আধুনিকতার প্রসার ঘটানো, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-মনস্কতার প্রসার এবং যথাযথ সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রসার।

জে.পি. নায়েক এই মতই পোষণ করতেন। আর্থ-সামাজিক, সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমির ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করে এই মতকে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। শিক্ষার মোড়কে একত্রিত হবে ভারতীয় ঐতিহ্যের জ্ঞান আর আধুনিক সময়ের প্রগতি। জে পি নায়েকের এই ধারণা বেশিদিন স্থায়ী হল না। শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে দেওয়া জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মহতী নকশা উপযুক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর অভাবে রূপায়ন করা সম্ভব হল না। ৭০ দশকের মাঝ সময় থেকে জে. পি. নায়েকের শিক্ষা-সমাজ সম্পর্ক সম্বন্ধে মত বদলাতে শুরু করল। তাঁর লেখায় ক্রমশ ধরা দিতে লাগল অন্য ধারার মতামতঃ–

১)শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজে যুগপৎ পুর্নবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা।

২) পুর্নবিন্যাসের জন্যে প্রয়োজন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা।

কিছু বছর পর সমাজ ও শিক্ষার মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে তাঁর ধারণা আরও তীক্ষ্ণ, ধারালো হতে শুরু করল। সারা ভারত সহ বিশ্বজুড়ে শিক্ষার স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে এসেছে। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক অচল-অনড় স্থিরতা। জে. পি. নায়েকের লেখায় প্রকাশ পেল "এক নতুন সমাজের দিগ্দর্শন"। তিনি ভারতীয় শিক্ষায় রাজনৈতিক বিষয়সূচি ঢোকালেন। গান্ধীবাদী ধারণা থেকে সরে না এসেও, বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিকতার মূল্যবোধের কাছে মেলাবার চেষ্টা করলেও, জে. পি. নায়েকের ভাবনায় স্থান পেল মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক সমতা। এই নতুন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করবে দেশের দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষ। আর শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে থাকা রাজনৈতিক কর্মী, সমাজকর্মীদের কাজ হবে এই দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া মানুষদের সংগঠিত করার। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সায়েন্স রির্সাচের (I..C.S.S.R) সঙ্গে জড়িত হওয়ার পর থেকে, সমাজবিজ্ঞান চর্চা, গবেষণার সঙ্গে জড়িয়ে যেতে গিয়ে জে. পি. নায়েকের শিক্ষা-ভাবনা এই দিশা পায়। জীবনের শেষ লেখায় তিনি শিক্ষা কমিশনে দেওয়া নিজের তত্ত্বের সমালোচনা করে গেছেন। তিনি কবুল করেছেন যে, ওই তত্ত্বে দরিদ্র-নিপীড়িত ভারতের কথা ভাবা হয়নি। ভারতের সমাজে ধন বন্টন, ক্ষমতা বন্টন, উপার্জনের ভয়ানক অসমতা জায়গা পায়নি। ভারতের মতো দেশে সমাজ পরিবর্তনে শিক্ষা যে প্রধান স্থান পেতে পারে না সেখানে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-কাজ যে জায়গা করে নেবে– তা তিনি স্বীকার করে গেছেন। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা জে. পি. নায়েকের একক অবদান কোনও দিনই ভুলবে না। যে সময়ে এদেশের শিক্ষা-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার মান তুচ্ছাতুচ্ছ, কেবলমাত্র অনুকরণের বিষয় হয়ে তা আটকে ছিল, সেখানে জে. পি. নায়েকের চিন্তা ভাবনা নতুন দিক খুলে দিয়েছিল। বহু গবেষককে নতুন নতুন কাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ভারতের তথা তৃতীয় বিশ্বের মুখপাত্র হয়ে জে. পি. নায়েক পৌঁছে গিয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে, তাঁর শিক্ষা ভাবনা নিয়ে।

"এই সৌরমণ্ডলের, এই পৃথিবীর এক কীর্তন খোলা নদীর পাড়ে যে শিশুর জন্ম। দিগন্তবিস্তৃত মাঠে ছুটে বেড়ানোর অদম্য স্বপ্ন যে কিশোরের। জ্যোৎস্না যাকে প্লাবিত করে। বনভূমি যাকে দুর্বিনীত করে। নদীর জোয়ার যাকে উল্লাসিত করে। অথচ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ঔপনিবেশিক জোয়াল গোলাম বানানোর শিক্ষাযন্ত্র। যাকে শৃঙ্খলিত করা হয়েছে স্বপ্নহীন সংস্কারে"।

রুদ্র মুহাম্মদ শাহীদুল্লাহ

এসো তাঁদের গল্প শোনাই

বিবেকানন্দ

উত্তর কলকাতার সিমলা স্ট্রীটের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে জন্ম হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের। তখন অবশ্য তিনি মোটেও স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন না। বাড়ির সেই ছোট্ট ছেলেটির নাম রাখা হয়েছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। আদর করে সবাই ডাকত -'বিলে' বলে। বিলের দাদু দুর্গাচরণ দত্ত ফারসী আর সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, তার সাথে ছিলেন তুখোড় আইনজ্ঞ। কিন্তু মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে, তাঁর ছেলে বিশ্বনাথের জন্ম হলে, তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বিলের বাবা বিশ্বনাথ দত্তও একজন জ্ঞানী-গুণী মানুষ ছিলেন। তিনি ইংরেজি এবং ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বাইবেল আর ফারসী কবি হাফিজের লেখা পড়তে তিনি খুব পছন্দ করতেন। আশেপাশের মানুষজন সবাই তাঁকে খুব সম্মান করে চলত। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের একজন দক্ষ আইনজীবী ছিলেন। বিশ্বনাথ দত্ত খুব দয়ালু একজন মানুষ ছিলেন। তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষকে সমানভাবে দান বা সাহায্য করতেন। তিনি সঙ্গীত-চর্চা করতে পছন্দ করতেন। তাঁর গানের গলা খুব ভাল ছিল। তিনিই চেয়েছিলেন যে, তাঁর ছেলে বিলে গানবাজনা নিয়ে পড়াশোনা করুক, কারণ তিনি মনে করতেন সঙ্গীত মানুষকে অনেক আনন্দ দেয়।

বিলের মা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন তাঁর বাবার সুযোগ্যা স্ত্রী। তিনি প্রখর বুদ্ধিমতী ছিলেন। সবাই তাঁকে সম্মান করত আর সব বিষয়ে তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দিত। তাঁর স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। রামায়ণ আর মহাভারতের অনেকখানি করে অংশ তাঁর মুখস্থ ছিল। তাঁর স্বামীর মতো তিনিও গরিব-দুঃখী মানুষদের সাহায্য করতে ভালবাসতেন।

এইরকম বাবা-মায়ের কোলে, ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারি জন্ম হয়েছিল নরেন্দ্রনাথের।

যে কোনও শিশুর জীবনে তার মায়ের প্রভাব সব থেকে বেশি। নরেন্দ্রনাথ অনেক পরে জানিয়েছিলেন কীভাবে তাঁর মা তাঁকে প্রথম ইংরেজি শব্দগুলি শিখিয়েছিলেন। মায়ের কাছেই তিনি বাংলা বর্ণমালা শিখেছিলেন।

মায়ের কোলে বসেই বিলে প্রথম রামায়ণ আর মহাভারতের গল্প শোনে। রামায়ণের গল্প শুনে ছোট্ট বিলের এত ভাল লাগত যে, সে রাম-সীতার একটা ছোট মাটির মূর্তি কিনে ফুল দিয়ে পুজো করত। মাঝেমধ্যে সে রামের বদলে শিবের পুজোও করত। কিন্তু আদতে সে রামায়ণ শুনতে খুব ভালবাসত। পাড়ায় কোথাও যদি রামায়ণ পাঠের আসর বসত, সেখানে বিলের দেখা মিলতই।

ছোটবেলা থেকে বিলে ধ্যান-ধ্যান খেলতে ভালবাসত। এই খেলার মধ্যেই মাঝে মাঝে ধ্যান করতে করতে সে এমন আত্মহারা হয়ে যেত, যে তার বাইরের জগৎ সম্পর্কে কোনও খেয়ালই থাকত না। একদিন এইভাবে সে বাড়ির এক কোণায় এমন গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে উঠেছিল যে বহুক্ষণ তার কোনও হুঁশ ছিল না। তাঁর বাড়ির লোক শেষ পর্যন্ত ঘরের দরজা ভেঙে তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে তাঁর চেতনা ফিরিয়ে আনে।

ভবঘুরে সাধুদের সম্পর্কে বিলের খুব আগ্রহ ছিল। বাড়ির দরজায় কোনও সাধু এসে দাঁড়ালেই বিলে খুব খুশি হয়ে তাকে বাড়ির ভেতর থেকে যা ইচ্ছা তাই এনে দিয়ে দিত। ঘুমাতে যাওয়ার সময়ে ছোট্ট বিলের একটা অদ্ভূত অভিজ্ঞতা হত। যেইমাত্র সে তার চোখ বুঝত, তার ভ্রূ-দুটির মাঝখানে এক ঝলমলে বিন্দু দেখা দিত, যা রঙ বদলাতে থাকত, আর এক সময়ে সেই বিন্দুটি বড় হতে হতে যেন তাঁর সারা শরীরকে উজ্জ্বল সাদা আলোয় ধুইয়ে দিত। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই ছোট্ট ছেলেটা ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ত। বিলে ভাবত, সবারই বুঝি এমনি হয়। কিন্তু এটা আসলে তাঁর ভবিষ্যতের বিশালত্বের দিকেই নির্দেশ করত।

ছোটবেলা থেকে বিলে ধ্যান-ধ্যান খেলতে ভালবাসত। এই খেলার মধ্যেই মাঝে মাঝে ধ্যান করতে করতে সে এমন আত্মহারা হয়ে যেত, যে তার বাইরের জগৎ সম্পর্কে কোনও খেয়ালই থাকত না।

তাই বলে ভেব না আমাদের নরেন, অর্থাৎ কিনা বিলে, খুব গম্ভীর একটা ছোট্ট ছেলে ছিল। সে কিন্তু আসলে ছিল একটা খুব দুষ্টু ছোট ছেলে। সে এত দুরন্ত ছিল যে তাঁকে মাঝে মাঝে সামলানো এতই কঠিন হয়ে পড়ত যে তাঁর পেছনে সবসময়ে বাড়ির দুজন দাসী বহাল ছিল। তাই তাঁর মা মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে বলতেন - "আমি শিবের মতো একটা ছেলে চাইলাম, আর শিব নিজে না এসে একটা ভূতকে পাঠিয়ে দিলেন।"

দুষ্টু বিলে দিদিদের-বোনেদের পেছনে লাগত, আর পেছনে তাড়া করে গেলেই খোলা নর্দমায় নেমে পড়ে তাদের মুখ ভ্যাংচাত। সে জানত, দিদিরা কিছুতেই নর্দমায় গিয়ে নামবে না। বাড়ির গরুটি ছিল তাঁর খেলার সাথী, আর তাঁর অন্য অনেক

পুষ্যি ছিল- একটা বাঁদর, একটা ছাগল, একটা ময়ূর, একঝাঁক পায়রা আর দুই-তিনটে গিনিপিগ। বাড়ির কাজের লোকেদের মধ্যে কোচোয়ান ছিল তাঁর বিশেষ বন্ধু, আর বিলে তাঁর দেখাদেখি বড় হয়ে সহিস হতে চাইত ---তাঁর মনে হত, মাথায় পাগড়ি বাঁধা আর হাতে চাবুক নিয়ে জুরিগাড়ি চালানো সহিস হওয়াটা একটা দারুণ ব্যাপার!

ছয় বছর বয়সে নরেনকে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হল। কিন্তু সেখানে নানা রকমের বন্ধুবান্ধবের সাথে মিশে সে এমন সমস্ত নতুন অভব্য শব্দ বলতে শিখল, যে বাড়ির লোকেদের সেইসব মোটেও পছন্দ হল না। তাই তাঁকে বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে এনে বাড়িতে শিক্ষক রেখে পড়ানোর ব্যবস্থা করা হল। নরেন দ্রুত নিজের পড়াশোনায় এগিয়ে যেতে লাগল। যখন অন্য ছেলেরা বর্ণমালা চিনতে ব্যস্ত, ততদিনে সে লিখতে-পড়তে শিখে গেছে। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁর শিক্ষক বই থেকে পড়ে যেতেন, আর সেটা শুনেই তাঁর পড়া হয়ে যেত। মাত্র সাত বছর বয়সেই সংস্কৃত ব্যাকরণ বই 'মুগ্ধবোধ' এবং রামায়ণ ও মহাভারতের অনেকটা করে অংশ তার মুখস্ত হয়ে গেছিল।

ছয় বছর বয়সে নরেনকে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হল। কিন্তু সেখানে নানা রকমের বন্ধুবান্ধবের সাথে মিশে সে এমন সমস্ত নতুন অভব্য শব্দ বলতে শিখল, যে বাড়ির লোকেদের সেইসব মোটেও পছন্দ হল না।

সাত বছর বয়সে, নরেন ভর্তি হল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠা করা মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে। সেখানে তাঁর শিক্ষকেরা সহজেই তাঁর প্রখর বুদ্ধির আন্দাজ পেলেন। কিন্তু পরে তাঁর ক্লাসের বন্ধুদের থেকে জানা গেছে, নরেন এত দুরন্ত ছিল যে, বেশিরভাগ সময়েই তাঁকে তাঁর ডেস্কে দেখতে পাওয়া যেত না।

নরেন তাঁর বন্ধুদের খুব প্রিয়পাত্র ছিল। তাঁর বন্ধুরা সবাই তাঁকে তাদের নেতা মেনে নিয়েছিল। তাঁর পছন্দের খেলা ছিল 'রাজার বিচারসভা'। একটা ক্লাসঘরের সব থেকে উঁচু ধাপ হত তাঁর সিংহাসন। সেই ধাপে আর কেউ বসতে পারত না। সেখানে বসে সে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে থেকে মন্ত্রী, সেনাপতি, যুবরাজ, কোটাল বেছে নিয়ে নিচের ধাপগুলিতে বসাত। তারপরে সে তাঁর দরবার চালাত আর রাজার মতো বিচার করত। কেউ তাঁর কথা না শুনলেই সে তার দিকে কটমট করে তাকাত।

খেলাধূলায় তাঁর উৎসাহের অভাব ছিল না। ইশকুলে টিফিনের ঘন্টা পড়লে, সে সবথেকে আগে খেয়ে নিয়ে সোজা খেলার মাঠে ছুটত। রোজ নিত্য-নতুন খেলা খেলতে তাঁর ভারি ভাল লাগত। তাই সে বন্ধুদের নিয়ে মাঝেমাঝেই নতুন খেলা বানাত। বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া হলে, তারা নরেনের কাছে সমস্যার সুরাহা চাইতে আসত।

নরেনের কিন্তু আরও একটা প্রতিভা ছিল। ক্লাসে শিক্ষকেরা পড়াতে থাকতেন, আর তার ফাঁকে ফাঁকেই সে কিন্তু বন্ধুদের রামায়ণ-মহাভারতের গল্প অথবা বাড়িতে কী কী দুষ্টুমি করেছে সেইসব গল্প বলত। একদিন ক্লাসে পড়ানোর সময়ে নরেন আর তাঁর বন্ধুরা কথা বলছিল। মাস্টারমশাই হঠাৎ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- বলত আমরা কী নিয়ে পড়াশোনা করছি? অন্য ছেলেরা চুপ করে রইল। কিন্তু নরেন বলে দিতে পারল তখন ক্লাসে কী পড়া হচ্ছিল। কী করে? কারণ নরেনের সেই অদ্ভূত শক্তি ছিল যা দিয়ে সে একসাথে একাধিক বিষয়ে মন দিতে পারত। তাই তাঁকে যত প্রশ্ন করা হল, সব বিষয়ে সে ঠিক ঠিক উত্তর দিল। তখন মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন - তোমাদের মধ্যে কে কথা বলছিল? সব ছেলেরা নরেনের দিকে দেখাল। মাস্টারমশাই তো বিশ্বাসই করতে চান না। তিনি ভেবেই পেলেন না এমন ছাত্রকে কী বলবেন!

তাঁর নির্ভয় এবং কুসংস্কারহীন চরিত্র নিয়ে আরও একটা গল্প আছে। নরেন তাঁর এক বন্ধুর বাড়ির বাগানে একটা গাছে চড়তে খুব ভালবাসত - গাছে চড়ে সে ফুল পাড়ত; তার সাথে সে গাছের ডাল থেকে পা ঝুলিয়ে দিয়ে, মাথা নীচের দিকে করে দুলতে থাকত, আর তারপরে সোজা ডিগবাজি খেত। এইসব হইচই হওয়ার ফলে সেই বাড়ির এক বুড়ো দাদু খুব বিরক্ত হচ্ছিলেন, তাই নরেনকে নিরস্ত করার জন্য তিনি ঠিক করলেন যে, ওই গাছে ভূত আছে, যে কিনা গাছে কেউ চড়লেই তার ঘাড় মটকে দেয়। নরেন চুপচাপ কথাটা শুনল। কিন্তু সেই বৃদ্ধ যেই ফিরে গেলেন, সে অমনি আবার গাছে চড়তে থাকল। তাঁর বন্ধুরা তো বৃদ্ধের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেছিল। তারা তাঁকে বারণ করতে লাগল। কিন্তু নরেন হেসে হেসে বলল -'তুই কি গাধা রে! আরে, এই বুড়ো দাদুর গল্প সত্যি হলে তো আমার ঘাড় অনেকদিন আগেই মটকে যেত রে!'

নরেন তাঁর এক বন্ধুর বাড়ির বাগানে একটা গাছে চড়তে খুব ভালবাসত - গাছে চড়ে সে ফুল পাড়ত; তার সাথে সে গাছের ডাল থেকে পা ঝুলিয়ে দিয়ে, মাথা নীচের দিকে করে দুলতে থাকত, আর তারপরে সোজা ডিগবাজি খেত।

নরেন ছিল সবার প্রিয়। পাড়ার সব পরিবার- সে ধনী হোক বা গরীব, উঁচু হোক বা নীচু জাত - সবার সাথেই তাঁর সুন্দর সম্পর্ক ছিল। তাঁর কোনও বন্ধু যদি কোনও কষ্টে পড়ত, তাহলে সে সবার আগে তাকে সান্ত্বনা দিতে যেত। সে এমন মজা-ফূর্তি করতে পারত যে, এমনকি সব থেকে গম্ভীর গুরুজনেরাও তাঁর কথায় হেসে ফেলতেন।

নরেন একঘেঁয়েমি একদমই পছন্দ করত না। সে বন্ধুদের নিয়ে একটা নাটকের দল খুলে ফেলল, আর নিজের বাড়ির ঠাকুর দালানে নাটকের অভিনয় করতে শুরু করল। তাঁর কিছুদিন পরে সে বাড়ির উঠোনে একটা কুস্তির আখড়া খুলে ফেলল, যেখানে তাঁর বন্ধুরা নিয়মিত শরীরচর্চা করত। সেটা বেশ কিছুদিন চলল, যতদিন না তাঁর এক ভাই নিজের হাত ভেঙে ফেলল। তারপরে সেটা থেমে গেল। তারপরে নরেন এক

পড়শির আখড়ায় গিয়ে যোগ দিল, আর সেখানে গিয়ে তলোয়ার চালানো, লাঠিখেলা, নৌকা চালানো আর অন্যান্য খেলা শিখতে শুরু করল। একবার সে পাড়ার খেলার প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিল। যখন সে এইসব নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তখন সে বাড়িতে ম্যাজিক লন্ঠনের ছবি দেখাত।

এইরকম সময়ে তাঁর ইচ্ছা হল রান্না শিখবে। সে বন্ধুদের জুটিয়ে যার যেমন সামর্থ্য চাঁদা যোগাড় করল। সব থেকে বেশি চাঁদা সেই দিল। আর সেই হল প্রধান রাঁধুনি।

এই দুষ্টু ছেলেটার কিন্তু কোনও অসৎ অভিসন্ধি ছিল না। সে কোনও ভাবেই কোনও খারাপ কাজ করত না। তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল সত্যি কথা বলা। সারাদিন সে খেলাধুলো - হই-হুল্লোড়ে সময় কাটালেও, রাতের দিকে সে ধ্যান করতে শুরু করল। নরেন যত বড় হতে লাগল, তাঁর প্রকৃতিতে তত পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল। সে নিয়মিত নানা রকমের বই এবং খবরের কাগজ পড়তে শুরু করল আর নানা রকমের আলোচনা সভায় যেতে শুরু করল। ফিরে এসে সে তাঁর বন্ধুদের সাথে সেইসব বিষয়ে নিজের মতো করে আলোচনা করত। তাঁর তর্ক-বিতর্ক করার ক্ষমতা দেখে বন্ধুরা হাঁ হয়ে যেত।

এই দুষ্টু ছেলেটার কিন্তু কোনও অসৎ অভিসন্ধি ছিল না। সে কোনও ভাবেই কোনও খারাপ কাজ করত না। তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল সত্যি কথা বলা। সারাদিন সে খেলাধূলো - হই-হুল্লোড়ে সময় কাটালেও, রাতের দিকে সে ধ্যান করতে শুরু করল।

১৮৭৭ সালে, নরেন যখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে, তাঁর বাবা মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে গেলেন। নরেনও সাথে গেল। রায়পুরে কোনও স্কুল ছিল না। এরফলে নরেন তাঁর বাবার সাথে অনেক বেশি করে সময় কাটাতে পারল। বাবার সাথে নরেনের নানা বিষয়ে আলোচনা হত। নরেনের বাবা মনে করতেন শিক্ষা মানে শুধুমাত্র অনেক তথ্য মাথায় রাখা নয়, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল স্বাধীন এবং উদার ভাবনাচিন্তা করতে শেখা। বিশ্বনাথ দত্তের সাথে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি দেখা করতে আসতেন। নরেন তাঁদের আলোচনা বসে শুনত, মাঝে মাঝে আলোচনায় যোগও দিত। এই সময়ে সে চাইত বড়রা সবাই তাঁর বিচার-বুদ্ধিকে যথেষ্ট সম্মান দিন। কেউ যদি তাঁর ভাবনা-চিন্তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা না দিত, তাহলে সে খুব রেগে যেত আর সবার সামনে সেটা প্রকাশও করে ফেলত। তাঁর বাবা এটা সব সময়ে পছন্দ করতেন না, কিন্তু একই সাথে ছেলের এই আত্মসম্মানবোধ দেখে মনে মনে গর্ব অনুভব করতেন।

১৮৭৯-এ বিশ্বনাথ দত্ত কলকাতায় ফিরে এলেন। নরেনকে আবার স্কুলে ভর্তি করাতে একটু অসুবিধা হল, কারণ সে দুই বছর স্কুল করেনি। কিন্তু তাঁর শিক্ষকেরা তাঁকে ভালবাসতেন আর তাই তাঁরা তাকে স্কুলে আবার ফিরিয়ে নিলেন। তখন নরেন পড়াশোনায় মন দিল, তিন বছরের পড়া এক বছরের মধ্যে শেষ করল, আর কলেজে ভর্তির পরীক্ষায় বেশ ভালভাবে পাশ করল।

এরপরে তো নরেন হয়ে উঠল অনেক বড় একজন মানুষ। দুনিয়াজুড়ে পরিচিত হল স্বামী বিবেকানন্দ নামে। কিন্তু সে তো অনেক বড় গল্প। এত ছোট পরিসরে তো তা আর বলা সম্ভব নয়। তাই সেই দুষ্টু কিন্তু বিশেষ ছেলে, যাঁর ডাকনাম বিলে আর ইশকুলের নাম নরেন্দ্রনাথ, তাঁর গল্প এখানেই শেষ হল।

সূত্রঃ স্বামী তেজসানন্দের লেখা 'আ শর্ট লাইফ অফ স্বামী বিবেকানন্দ'

গ্রামীণ শিক্ষায় 'নবদিশা'

নবদিশা মনে করে, গ্রাম হচ্ছে শিক্ষার আদর্শ গবেষণাগার। বিশেষ করে সেই শিক্ষা যখন হয়, পরিবেশ নির্ভর হাতে-কলমে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা। যেখানে শিখে ছাত্রছাত্রীরা নানান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে এবং তা নিয়ে নিজেরা নিরন্তর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লিপ্ত থাকবে। গ্রামের প্রবীণ মানুষেরাই হচ্ছেন গ্রামের অতীত সময়ের সাক্ষী, স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাদের কাছ থেকেও আমাদের ছাত্রছাত্রীরা অনেক কিছু জানতে ও শিখতে পারে। শিক্ষা হয়ে উঠুক আঞ্চলিকভাবে প্রাসঙ্গিক, যে শিক্ষা গুরুত্ব দেবে মানুষের মৌলিক চাহিদাকে। এই স্বপ্ন বুকে নিয়েই পথ চলছে নবদিশা।

আসলে সমাজকে গড়তে হলে আগে সেই সমাজের মানুষ গড়ার আয়োজন করতে হবে। আর সেই মানুষ গড়ার আয়োজনই হল আসল শিক্ষা। কোনও কিছু শেখাই শুধুমাত্র শিক্ষা নয়, সমগ্র জীবন ও জগতের মধ্যে সেতুবন্ধন করার নামই শিক্ষা বলে বিশ্বাস করে নবদিশা।

সেই সময়

প্রায় দেড়শ বছর আগে A STATISTICAL ACCOUNT OF BENGAL গ্রন্থটি লিখেছিলেন ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ। মোট ২০টি খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিতে তৎকালীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্থান ও জেলার ভৌগলিক বিবরণ সহ সেখানকার অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা ও তাদের আর্থ-সামাজিক চিত্র, নানা তথ্য ও পরিসংখ্যানসহ যেভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে, তাতে তৎকালীন বাংলার জেলাভিত্তিক যে পরিচয় আমরা পাই – তা আজও প্রাসঙ্গিক। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা যদি একবার সেই পুরনো দিনগুলির দিকে তাকাই, তাহলে বুঝতে পারব এখন আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। এখন দেখা যাক, কেমন ছিল সেই সময়।

বীরভূম

বীরভূম জেলার আয়তন ১৩৪৪ বর্গমাইল এবং তৎকালীন অর্থাৎ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের সেনসাস অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৬৯৬,৯৪৫ জন। তখন এই জেলার প্রধান শহর ছিল সিউড়ি এবং এই সিউড়ি শহর থেকেই গোটা জেলার প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হত। এই জেলায় অজয় নদী ছাড়াও দ্বারকা, হিংলা, ময়ূরাক্ষী, কোপাই ইত্যাদি নদীর নাম জানা যায়। একমাত্র বর্ষাকালেই নদীগুলিতে নৌকা ইত্যাদি চলাচল করত। এ সময় এই জেলায় লেক বা ক্যানেল ইত্যাদির অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের সেনসাস অনুযায়ী, এই জেলার মোট জনসংখ্যার কথা (৬৯৬,৯৪৫ জন) জানা যায়। তৎকালীন প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই জনসংখ্যার বসবাসের জন্য গৃহের সংখ্যা ছিল ১৬০,২০৬টি এবং এই জেলায় গ্রামের সংখ্যা ছিল মোট ২৪৭৮টি। প্রতি বর্গমাইলে বসবাস করত ৫১৮ জন। প্রতি গ্রামে বসবাস করত গড়ে ২৮১ জন। সে সময় গোটা বীরভূম জেলাটি ৮টি থানা সার্কেলে বিভক্ত ছিল। এই ৮টি থানা সার্কেল হল- সিউড়ি, রাজনগর, দুবরাজপুর, কসবা, সাকুলিপুর, লাভপুর, বারোয়াঁ এবং ময়ূরেশ্বর । উপরোক্ত মোট জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা হল ৩৩৫,০৫২ জন এবং মহিলার সংখ্যা হল ৩৬১৮৯৩ জন। ধর্ম অনুযায়ী হিন্দু ধর্মের জনসংখ্যা ছিল মোট ৫৭৮,৮১৬ জন, মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মোট জনসংখ্যা ১১০,৯৫৪ জন, খ্রীস্ট ধর্মের মানুষের সংখ্যা ছিল ২৪৭ জন। এই জেলায় অন্যান্য আরও অনেক ধর্মের কথা জানা গেলেও বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মের মানুষের কথা জানা যায় না।

ওই সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী বীরভূম জেলায় অন্যান্য রোগের চেয়ে লেপ্রসি বা কুষ্ঠ রোগের উপস্থিতি ছিল সাধারণ ঘটনা। এ সময় জেলায় বধির মানুষের সংখ্যা ছিল মোট ২৬৮ জন। এরমধ্যে মহিলা বধিরের সংখ্যা হল ৭৬ জন এবং পুরুষ বধিরের সংখ্যা হল ১৯২ জন। অন্ধ মানুষের সংখ্যা ছিল মোট ৫৯২ জন। যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা হল ৩৯০ জন এবং মহিলার সংখ্যা হল ২০২ জন।

এই জেলার প্রধান শহর সিউড়ির বাসিন্দা ছিল মোট ৯০০১ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা হল ৪৬১৭ জন এবং মহিলার সংখ্যা ছিল ৪৩৮৪ জন। এই শহরটি ছিল জেলার খাটাঙ্গা পরগনায় অবস্থিত। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে এই শহরের মিউনিসিপ্যাল ইনকাম ছিল ৪৮৩৯ টাকা এবং ব্যয় ছিল ৪৭৩৪ টাকা।

সিউড়ি শহরের পাশাপাশি রাজনগর বা নগর স্থানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হরিপুর পরগনায় অবস্থিত এই স্থানটি প্রাচীনকালে বীরভূম জেলার রাজধানী ছিল। আনুমানিক ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে বা তার পরে বখতিয়ার খিলজি এই রাজনগর থেকে দেওকোট পর্যন্ত একটি হাইওয়ে তৈরি করেছিলেন। দেওকোট স্থানটি অবস্থিত ছিল গৌড়ের কাছে। সে সময় রাজনগর থেকে দেওকোটের দূরত্ব ছিল দশ দিনের যাত্রাপথের সমান। রাজনগর বা নগর স্থানটি বর্তমানে ধ্বংসাবশেষে পরিণত। এরমধ্যে বীরভূম জেলার ইলামবাজার, সুরুল, দুবরাজপুর, বোলপুর প্রভৃতি শহরগুলি ছিল মূলত ব্যবসাকেন্দ্রিক।

তৎকালীন বীরভূম জেলার গনুটিয়া নামক স্থানটি রেশম শিল্পের কেন্দ্র হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিল। রাজনগর বা নগরের কয়েক মাইল দক্ষিণে হরিপুর পরগনায় অবস্থিত ছিল তাঁতিপাড়া। সেই সময়ে ধান চাষের জন্য তাঁতিপাড়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেও তসর সিল্কের জন্যও তাঁতিপাড়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। তৎকালীন

কলকাতার বাজারে এই তসর সিল্কের কাপড় তাঁতিপাড়া থেকেই আমদানি করা হত। তাঁতিপাড়ার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল বাকেশ্বর (বক্রেশ্বর?)। উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য এটিকে বলা হত ভূম বাকেশ্বর। এসময় হান্টারের বর্ণনা থেকে বীরভূম জেলার অন্যান্য যে সব স্থানগুলির নাম বিশেষভাবে জানা যায়, সেগুলি হল মৌরেশ্বর, কেদুঁলি, বোলপুর, আহমদপুর, সাঁইথিয়া, মল্লারপুর প্রভৃতি। বোলপুর, আহমদপুর, সাঁইথিয়া, মল্লারপুর প্রভৃতি স্থানে রেল লাইনের যোগাযোগ থাকলেও এইসব স্থানগুলির সাথে কাটোয়া শহরের যোগাযোগ ছিল মূলত জলপথে।

এসময় বীরভূম জেলার সাধারণ মানুষের জীবনযাপনও ছিল অত্যন্ত সাধারণ। তাদের প্রচলিত খাদ্য ছিল চাল, ডাল, শাক-সবজি এবং মাছ। তৎকালীন জেলা কালেক্টরের তথ্য অনুযায়ী জানা যায় যে, এই সময় স্বচ্ছল মানুষের বেঁচে থাকার জন্য আনুমানিক খরচ ছিল প্রতি মাসে ১৫ টাকা, কিন্তু সাধারণ চাষী তথা সাধারণ মানুষদের খরচ ছিল প্রতি মাসে ৪ টাকা থেকে ৫ টাকা। সাধারণ মানুষেরা বসবাস করতেন মাটির দেওয়াল ঘেরা বাড়িতে। পোশাক হিসেবে তাদের মধ্যে ধুতি-কাপড়ের প্রচলন ছিল।

এই বীরভূম জেলার নামকরণ নিয়ে নানা রকম ধারণা প্রচলিত রয়েছে। বিষ্ণুপুরের রাজা এই জেলার মাটিকে মনে করতেন – বীর মাটি। তাঁর ধারণা অনুযায়ী, এই জেলার মাটিতে রয়েছে বিশেষ এনার্জি এবং ক্ষমতা বা পাওয়ার।

তৎকালীন বীরভূম জেলার প্রধান ফসল ছিল ধান। প্রধানত আউশ এবং আমন ধানের চাষ হত। আবার আউশ এবং আমন ধানের বিভিন্ন রকম ভাগ ছিল। তৎকালীন জেলা কালেক্টরের তথ্য অনুসারে জানা যায় যে, তখন বীরভূম জেলায় মোট ৬৬ ধরনের ধানের চাষ হত। এই ৬৬ ধরনের ধানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলঃ আউশ গোটা, আউশ ভাসা, আউশ কাটকি, ছোটা কাটকি, বড় কাটকি, দুধ সাল, সিঁদুরমুখী, কেয়া, মাহিফল ইত্যাদি।

এই জেলায় বৃহৎ আকারে বা বৃহৎ এলাকা জুড়ে আখ ও পানের চাষও হত। এই জেলায় চাষীরা ধান থেকে তৈরি করতেন চাল, চাল ভাজা, চিড়ে ও মুড়ি। এই সময় চাল থেকে এক ধরনের পানীয় তৈরি হত। এই পানীয়কে রাইস বিয়ার বলা যেতে পারে। এটি পান করতেন মূলত স্থানীয় সমাজের নিম্ন শ্রেণির মানুষেরা এবং আদিবাসীরা।

তৎকালীন বীরভূম জেলার প্রধান ফসল ছিল ধান। প্রধানত আউশ এবং আমন ধানের চাষ হত। আবার আউশ এবং আমন ধানের বিভিন্ন রকম ভাগ ছিল।

সে সময় লাক্ষা, নীল প্রভৃতির চাষও হত। সে সময় Messrs. Erskine & Co.-র অধীনে বীরভূম জেলায় মোট ৮টি নীল কারখানা ছিল। এই কোম্পানির লাক্ষা ব্যবসা ছিল ইলামবাজারে। এই লাক্ষা থেকেই তৈরি হত চুড়ি। এই বীরভূম জেলা থেকেই তখন কলকাতার বাজারগুলিতে নিয়মিতভাবে লাক্ষা রপ্তানি করা হত, নীল, র সিল্ক, তৈলবীজ প্রভৃতি। আর জেলায় আমদানি করা হত লবণ, সুতির কাপড়, ডাল, তামাক, গম এবং বিভিন্ন ধাতু দ্রব্য। সে সময়ে বীরভূম জেলায় যে সব স্থানগুলি মূলত ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব পেত, সেগুলি হল দুবরাজপুর, ইলামবাজার, বোলপুর, সাঁইথিয়া, পুরন্দরপুর, কীর্ণাহার, মহম্মদবাজার প্রভৃতি। সিউড়ি শহরটি জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব পেলেও ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে ছিল গুরুত্বহীন। তৎকালীন বীরভূম জেলায় একটি মাত্র কারাগার ছিল সিউড়ি শহরে অবস্থিত এবং একটি লকআপ ছিল সাঁইথিয়া শহরে।

এই বীরভূম জেলার নামকরণ নিয়ে নানা রকম ধারণা প্রচলিত রয়েছে। বিষ্ণুপুরের রাজা এই জেলার মাটিকে মনে করতেন – বীর মাটি। তাঁর ধারণা অনুযায়ী, এই জেলার মাটিতে রয়েছে বিশেষ এনার্জি এবং ক্ষমতা বা পাওয়ার। সে কারণে তিনি এর নাম দেন বীরভূমি। অন্য একটি প্রচলিত ধারণা থেকে জানা যায় যে, এই স্থানে প্রাচীনকালে অনেক বীরের জন্ম হয়েছিল, সে কারণে এর নাম বীরভূম অর্থাৎ Land of Heroes. আবার অন্য একটি প্রচলিত ধারণা থেকে জানা যায় যে, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে বীর শব্দের অর্থ জঙ্গল। এটা থেকেও বীরভূম শব্দের উৎপত্তি হতে পারে।

হান্টারের বর্ণনা থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে তৎকালীন বীরভূম জেলার যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা থেকে জানা যায় যে ১৮৫৬-৫৭ সালে সরকারি ইংলিশ স্কুলের সংখ্যা ছিল মাত্র ১ টি, ১৮৬০-৬১ সালে তা বেড়ে হয় ২ টি এবং ১৮৭০ -৭১ সালে তা পুনরায় কমে গিয়ে হয় ১ টি। ১৮৭০-৭১ সালে সাহায্য প্রাপ্ত ইংলিশ স্কুলের সংখ্যা ছিল ২১ টি এবং সাহায্য প্রাপ্ত ভার্নাকুলার স্কুলের সংখ্যা ছিল ৫৪টি। সাহায্য প্রাপ্ত গার্লস স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩ টি। ১৮৭২-৭৩ সালে সাহায্য প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১০৩ টি এবং সেগুলিতে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩২৭০ জন, আর মোট শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১০৮ জন। সাহায্য প্রাপ্ত নয়, এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৫ টি, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪০৯ জন এবং শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১৫ জন।

১৮৭২-৭৩ সালে সাহায্য প্রাপ্ত গার্লস স্কুলের সংখ্যা ছিল ২টি, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৯ জন এবং শিক্ষকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ জন। আরও বিশদভাবে জানা যায় যে, তৎকালীন বীরভূম জেলায় গার্লস স্কুলের সংখ্যা ছিল মোট ৩টি, এরমধ্যে ২টি স্কুল ছিল সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত আর তৃতীয় স্কুলটি ছিল পাঠশালা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। সিউড়ি গার্লস স্কুলটি ব্যাপটিস্ট ম্যানেজমেন্ট দ্বারা পরিচালিত হত।

ইংরেজি ও বাংলা উভয় মাধ্যমেই স্কুলটিতে পড়াশোনা হত। এসময় বীরভূম জেলায় কিছু মক্তবেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মক্তবগুলিতে মূলত মুসলমান সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরাই পড়াশোনা করত।

শিখনের আনন্দ, আনন্দময় শিখন এবং সক্রিয়তার নতুন পথ

Centre for Environment Education এবং Vikram A Saralehai Community Science Centre ও VIKSAT এবং Darpana Academy of Performing Arts এবং যৌথ উদ্যোগে প্রধানত NCERT-র জন্য Joy of Learning নামক একটি Handbook of Environment Education Activities প্রকাশিত হয়েছিল, যার কেন্দ্রীয় দর্শনটি ছিল পাঠ এবং প্রতিদিনের জীবনে যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করা হয় তার যথাযোগ্য ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সামনে জ্ঞানের ফলিত জাতটি উন্মোচিত করা। যেখানে জ্ঞান গঠনের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ শুধু সুনিশ্চিত নয়, সুসংবদ্ধ এবং সুপরিকল্পিত।

বিগত এক বছরের ও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন সময়ে 'নবদিশা' তার সীমিত ক্ষমতার পরিসরে সক্রিয়তা ভিত্তিক শিখনের আনন্দময় দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছে এবং পূর্ব ভারতের অঞ্চলগত প্রেক্ষিতগুলি বিবেচনার মধ্যে রেখে 'নবদিশা'-র পৃষ্ঠায় আমরা আলোচনা করেছি, গ্রাম-ভারতের নতুন প্রজন্ম এখন বিদ্যালয়গামী, তাকে যদি সুশিক্ষিত বা বলা ভাল প্রকৃত শিক্ষিত করতে হয়, শিখনের এই প্রকৃতি ছোঁয়া মাত্রাগুলি আরও শক্তিশালী করে তোলা খুব জরুরি। যাতে শিক্ষা শুধু বস্তুগত সাফল্য নয়, সার্থকতার নতুন দিশা দেখাতে পারে আগামী প্রজন্মগুলির জন্য।

এই পুস্তিকা থেকে আমরা দু'টি মডিউল বেছে নিয়ে তার ভাবানুষঙ্গগুলি অপরিবর্তিত রেখে প্রকাশ করলাম। যাতে অনুরূপ মডিউল শিক্ষকবৃন্দ নিজেরাই তৈরি করতে পারেন।

দেওয়াল চিত্রের লক্ষ্যঃ শিক্ষার্থীদের প্রাকৃত এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্প-মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে উজ্জীবিত করা।

সক্রিয়তাঃ শিক্ষার্থীদের সামনে খুব মনোগ্রাহীভাবে তুলে ধরা হবে কীভাবে বহু প্রাচীনকাল থেকে দেওয়াল চিত্র হয়ে উঠেছে মানুষের অভিব্যক্তির একটি মাধ্যম। এমনকি এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করা হয়। শিক্ষার্থীদের একটি পূর্ণ দেওয়াল ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে তাদের ছবি আঁকার জন্য অথবা যদি তা সম্ভব না হয় তবে দেওয়ালে অনেকগুলি কাগজ পরপর সেঁটে তার ওপরে শিক্ষার্থীদের আঁকতে উৎসাহিত করা যেতে পারে। তাদের এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উৎসাহ দিতে হবে ছবি আঁকার পরম্পরাগত পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্য।

এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা মাটির মণ্ডের ওপরেও আঁকতে পারে। তাদের উৎসাহিত করতে হবে জীবনের দৈনন্দিন প্রেক্ষিত থেকে ছবির বিষয় খুঁজে নেওয়ার জন্য। অন্যদিকে তারা মেঝের ওপরে আলপনাও আঁকতে পারে।

এই পুরো সক্রিয়তা পরিচালনা করার সময় আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অঙ্কন কৃৎকৌশল সম্পর্কে তাদের অবগত করা যেতে পারে।

সময়সীমাঃ এর থেকে দু'ঘণ্টা প্রয়োজনীয় উপাদান কাগজ, রং, তুলি, চক, পেন্সিল এবং প্রকারভেদে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম।

বীজ সংগ্রহশালার লক্ষ্যঃ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বীজের বিপুল ভাণ্ডার এবং তার বৈচিত্র্য সম্পর্কে এক ধরনের ধারনা সূচি করা।

সক্রিয়তাঃ শিক্ষার্থীদের বলা হবে বিভিন্ন ধরনের বীজ সংগ্রহ করার জন্য। যেগুলি তারা তাদের পরিবার, নার্সারী অথবা স্থানীয় গাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের বলা হবে যেন তারা বীজের গঠন, আকৃতি, রং এবং প্রাপ্তিস্থান অনুসারে তার শ্রেণি বিভাজন করার জন্য। প্রয়োজনমতো শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে একটি প্রদর্শনীও করতে পারে, এইসব বীজের। এখানে শিক্ষার্থীদের বলা যেতে পারে যেন তারা এইসব বীজ তাদের সাথে বিনিময় করতে পারে, যারা এইসব বীজ দিয়ে গাছের চারা তৈরি করবে।

শিক্ষার্থীদের দু'ধরনের বীজ নিয়ে কিছু নিরীক্ষাও করানো যেতে পারে।

যেমন কিছু বীজ নিয়ে যদি জলে ভিজিয়ে রাখা হয় তাহলে দেখা যাবে সেইসব আর্দ্র বীজগুলির খোসা কুঁচকে গেছে এবং সেগুলি আকৃতিতে কিছুটা বড় হয়ে গেছে। এর কারণ তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে।

সময়সীমাঃ এক ঘণ্টা প্রয়োজনীয় উপাদান বীজ, জলপাত্র ইত্যাদি।

"শিক্ষদের তিনটি ভালবাসার জায়গা রয়েছেঃ শিখনের ভালবাসা, শিক্ষার্থীর ভালবাসা এবং এই প্রথম দুই ভালবাসাকে একত্রে নিয়ে চলার ভালবাসা।"

- স্কট হেডেন

প্রাচীন সভ্যতায় শিক্ষার পত্তন ও পতনের ইতিহাস

উপমহাদেশের ইতিহাস বিশাল বৈচিত্র্যে ভরপুর। এখানে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠি ধর্মের নানামুখী সংঘাত ও সংমিশ্রণের ইতিহাস, একইসাথে আছে শিক্ষা-সভ্যতার প্রগতি ও পতনে ভরা ইতিহাস। মধ্যযুগে এই ইতিহাস রচনায় কাণ্ডারী ছিলেন বৌদ্ধ নৃপতিগণ। সংসারত্যাগী বুদ্ধ মতবাদের প্রচার প্রসার ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে গিয়ে তারা রাজ্যজুড়ে স্থাপন করেছেন অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার। এইসব বিহার থেকে কিছু কিছু বিহার পরে অবাধ জ্ঞানচর্চা করতে গিয়ে ধীরে ধীরে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের খোলস ছাড়িয়ে হাজার বছর আগে খ্যাতি পেয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপে। তারমধ্যে-

বিক্রমশীলা:- ভারতের ভাগলপুর জেলার আন্টিচক, মাধোরামপুর, উরিয়াপ এই তিনটি গ্রাম নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল।

সোমপুর:- বাংলাদেশের নওগাঁয়।

ওদন্তপুরী:-মগধে অবস্থিত ছিল। পাটনা, গয়া আর বাংলার কিছু অঞ্চল নিয়ে মগধ রাজ্য গঠিত ছিল।

জগদ্দল:- বীরেন্দ্র ভূমিতে অবস্থিত ছিল। বাংলাদেশের রাজশাহী, পঞ্চগড়, ঠাকুর গাঁও, দিনাজপুর, নওগাঁ এবং ভারতের মালদা নিয়ে গঠিত ছিল। কোনও কোনও ঐতিহাসিক জগদ্দল নওগাঁয়ে আবার কেউ জগদ্দলকে দিনাজপুরে স্থাপিত হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেন। তবে যেখানেই হোক না কেন সেটা যে বাংলাদেশের ভূখন্ডেই ছিল সেটা নিশ্চিত।

তক্ষশীলা:-পাকিস্থানেআবস্থিতছিল।বর্তমানইসলামাবাদের ৩৫ কিলোমিটার পশ্চিমে ও রাওয়ালপিন্ডির কিছু উত্তর-পশ্চিমে। প্রাচীন ভারতের অর্থশাস্ত্রের জনক বলে খ্যাত চাণক্য এখানেই লেখাপড়া করেন। শিক্ষা শেষে তিনি এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের আচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন অনেক দিন। নালন্দার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবকাঠামোর ভিত্তিভূমি স্থাপন করে দিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ শাসকরা আমাদের প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার যে রাস্তা তৈরি করে গিয়েছিলেন, সেখানে থেকে আমরা কেন আলোর পথ পরিহার করে অন্ধকারের পথে হাঁটা শুরু করলাম? এই কেন প্রশ্নের উত্তর খোঁজা শুরু করলে সর্ব প্রথম যে সহজ সরল উত্তরটি আমাদের সামনে ভেসে আসে তা হল ধর্মীয় বিদ্বেষ ও হিংসা। বৌদ্ধ শাসনকালে হিন্দু ব্রাহ্মণদের আয় রোজগারের পথ বন্ধ হওয়ায় ও সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়ায় তাদের মনের ভিতর যে আগুন বংশপরম্পরায় হাজার বছর ধরে গোপনে অতি কষ্টে সংরক্ষিত ছিল তার বিষ্ফোরন ঘটে হিন্দু রাজাদের শাসনকালে এসে। সুযোগ হাতে পেয়েই তারা নিরীহ প্রগতিশীল বৌদ্ধদের নির্মম অত্যাচার, উৎপীড়ন, দমন ও হত্যা করে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করে। রাজ আনুকুল্য বন্ধ করে ধস নামায় এইসব সার্বজনীন শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের, উপরন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় জোড়ালো করেছিল দেবদাসী, সহমরণ ও তীব্র জাতিভেদ প্রথার মতো ঘৃণ্য সব প্রথার। ব্রাহ্মণ্যবাদের আলোচনা-সমালোচনা করা আমার মুখ্য বিষয় নয়। প্রারম্ভিক কথাগুলি কান টানলে মাথা আসার মতই। আমার আলোচনা নালন্দার সফল অগ্রগতি ও শেষে করুণ পরিণতি নিয়ে। পাল রাজাদের আমলে সোমপুর, বিক্রমশীলা ও নালন্দা একই প্রশাসনের অধীনে কাজ করত। প্রয়োজনে শিক্ষকরা এই তিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসা-যাওয়া করে উন্নত শিক্ষার মান বজায় রাখার চেষ্টা করতেন।

চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এবং ভারতীয় ইতিহাসবিদ্ প্রজ্ঞাবর্মণ গুপ্ত রাজা কুমার গুপ্তকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করে গেছেন। খননকার্যে প্রাপ্ত একটি সীলমোহর থেকেও এই দাবির পক্ষে জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায়। “নালন্দা” শব্দটি এসেছে “নালম” এবং “দা” থেকে শব্দ থেকে। “নালম” শব্দের অর্থ পদ্ম ফুল, যা জ্ঞানের প্রতীকরূপে প্রকাশ করা হয়েছে আর “দা” দিয়ে বুঝানো হয়েছে দান করা। তার মানে “নালন্দা” শব্দের অর্থ দাঁড়ায় “জ্ঞান দানকারী”, প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ৮০০ বছর ধরে নিরলসভাবে জ্ঞান বিতরনের মতো দুরূহ কাজটি করে গেছে। নালন্দা ঠিক কবে স্থাপিত হয়েছিল তা আজ সঠিকভাবে বলা হয়তো সম্ভব নয়। কোথাও পেলাম ৪২৭ খ্রিষ্টাব্দ আবার এক জায়গায় পেলাম ৪৫০, তা যাই হোক, ধরে নিলাম ৪২৭ থেকে ৪৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেকার কোনও এক সময়ে এটি স্থাপিত হয়ে থাকবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান ভারতের বিহার রাজ্যের রাজধানী পাটনা থেকে ৫৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত “বড়গাঁও” গ্রামের পাশেই। পাটনার আদি নাম পাটলিপুত্র। দুই হাজার তিনশো বছর আগে মৌর্যদের রাজধানী ছিল এই পাটলিপুত্র। সম্রাট অশোক এখান থেকেই রাজ্য পরিচালনা করতেন বলে জনশ্রুতি আছে। “বিহার” শব্দের অর্থ “বিচরণ”, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যেখানে অবস্থান করেন বা বিচরণ করেন তাকে বলে “বৌদ্ধ বিহার”, প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার স্বর্ণযুগে এই অঞ্চলে প্রচুর বৌদ্ধ বিহারের উপস্থিতি থাকায় পরবর্তীতে ভারতের এই রা্জ্যের নামকরণ হয়েছে “বিহার”। মৌর্যদের পর বিহার চলে আসে গুপ্ত রাজাদের শাসনে। পরে মোগল সম্রাট আকবর ১৫৭৪ সালে বিহার দখল করেন। মোগলদের পর হাত বদল হয়ে বিহার নবাবদের দখলে আসে। নবাব সিরাজদৌল্লাকে পরাজিত করে ইংরেজরা এরপর বিহার দখলে নেয়। ১৯১১ সালে বাংলা থেকে বিহার ও উড়িষ্যা পৃথক হয়।

নালন্দা প্রাথমিক অবস্থায় ছিল একটি মহাবিহার। যেখানে মূলত বৌদ্ধ দর্শনের খুঁটিনাটি, বুদ্ধের শিক্ষা, বুদ্ধের অনুশাসন বিষয়ে পাঠদান চলত। স্থিতিশীল রাজ্য পরিচালনা, দেশ ও জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে একটি সভ্য, উন্নত ও প্রগতিশীল মনন সম্পন্ন জাতির কোনও বিকল্প নেই। যা তৈরি করতে শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, এসত্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তৎকালীন নেতৃস্থানীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক বৌদ্ধ শাসকেরা। তাদের যৌথ আন্তরিক প্রচেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়ে বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার উপযোগী, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আরও অনেক শাখা যুক্ত করে তারা নালন্দাকে ধর্মের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন। সম্রাট অশোক এখানে একটি বিহার তৈরি করেছিলেন। গুপ্ত সম্রাটরাও কয়েকটি মঠ নির্মাণ করে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখেন। মূলত গুপ্ত সম্রাট কুমার গুপ্তের আমলেই এই মহাবিহারটির পূর্ণ বিকাশলাভ করে। পরবর্তীতে বৌদ্ধ সম্রাট হর্ষবর্ধন ও বাংলার পাল সম্রাটরা পৃষ্ঠপোষকতা করে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে খ্যাতির চূড়ান্ত শিখরে নিয়ে যান।

তৎকালীন সময়ে নালন্দাকে তাঁরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম সেরা হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। যে কেউ ইচ্ছে করলেই নালন্দায় লেখাপড়ার সুযোগ পেত না। এরজন্য প্রয়োজন হত শিক্ষার্থীর যোগ্যতা। শিক্ষার্থী সত্যিই নালন্দায় লেখাপড়া করার যোগ্য কিনা, তা প্রমাণের জন্য প্রবেশদ্বারে দিতে হত মৌখিক পরীক্ষা। সাফল্যের সাথে এই ভর্তি পরীক্ষায় উতরে গেলেই মিলত এখানে বিদ্যালাভের নিশ্চয়তা। পরীক্ষা মোটেই সহজ ছিল না। এতটাই কঠিন ছিল, প্রতি দশজনে মাত্র তিনজন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারত। ভাবতে অবাক লাগে তৎকালীন সময়ে নালন্দায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১০,০০০, তাদের শিক্ষাদান করতেন আরও প্রায় ২,০০০ শিক্ষক। গড়ে প্রতি ৫ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষক ছিল। কত বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলে, এত বিপুল সংখ্যক ছাত্রের বিদ্যাদান সম্ভব। তাও আবার থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থাসহ, ভেবে সত্যিই অবাক না হয়ে উপায় নেই। এই বিশ্ববিদ্যালয়টির বিশাল খরচ চালানোও যেনতেন বিষয় ছিল না। অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় যাতে নালন্দার প্রশাসনকে কারও উপর নির্ভরশীল হতে না হয়, সেদিক বিবেচনা করে ২০০টি গ্রামকে শুধুমাত্র নালন্দার ব্যয় মিটানোর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন বিদ্যোৎসাহী বৌদ্ধ শাসকরা। এইসব গ্রামগুলির অবস্থান শুধু যে নালন্দার আশেপাশের ছিল তা নয়, সমগ্র বিহার রাজ্যের ৩০টি জেলাজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল গ্রামগুলি। চিনতে পারার সুবিধার্থে বিশেষ চৈত্য বা স্তূপ তৈরি করে গ্রামগুলিকে অন্য গ্রাম থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছিল। এইসব গ্রামের করের টাকা থেকেই ছাত্র ও শিক্ষকদের খাদ্যদ্রব্য সহ প্রয়োজনীয় সব খরচের যোগান আসত।

বাইরের কোনও প্রকার উটকো ঝামেলা যাতে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে সেজন্য লাল ইঁটের উঁচু বেষ্টনি দিয়ে ঘেরা ছিল সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। ভিতরে ঢোকার জন্য ছিল বিশাল প্রবেশদ্বার। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ছিল ৮টি ভিন্ন ভিন্ন চত্বর, শ্রেণিকক্ষ, ধ্যানকক্ষ এবং ১০টি মন্দির। শিক্ষার প্রাকৃতিক পরিবেশ যথাসাধ্য স্নিগ্ধ ও কোমল রাখতে সমগ্র প্রাঙ্গণ জুড়ে তৈরি করা হয়েছিল বেশ কিছু সুরম্য উদ্যান। যেগুলি বিচিত্র ফুল-ফলের গাছ দিয়ে ছিল ভরা। গোসল ও

প্রয়োজনীয় পানির সুবিধার জন্য খনন করা হয়েছিল কয়েকটি দীঘি। ছাত্রদের জন্য ছিল ছাত্রাবাস। পানির সমস্যার কারণে ছাত্রদের জ্ঞানার্জনে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেদিকটা মাথায় রেখে প্রতিটি ছাত্রাবাসে পানীয় জলের অসুবিধা দূর করতে তৈরি করা হয়েছিল বেশ কিছু কুয়ো। মোট কথা সমগ্র নালন্দা ছিল নিখুঁত পরিকল্পনায় গড়া একটি শিক্ষাস্বর্গ। বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি এখানে বোধ, বিতর্ক, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ, সাহিত্য, গণিত, জ্যোতিষবিদ্যা, শিল্পকলা, চিকিৎসাশাস্ত্র সহ তৎকালীন সর্বোচ্চ শিক্ষাব্যবস্থার উপযোগী আরও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নিয়মিত পাঠদান চলত। শিক্ষকদের পাঠদান আর ছাত্রদের পাঠগ্রহণে সর্বদা মুখরিত থাকত এই বিদ্যাপীঠ। নালন্দার সুশিক্ষার খ্যাতির সুবাতাস এতটাই ছড়িয়ে পড়েছিল যে, অনুন্নত প্রতিকূল এবরো-থেবরো যোগাযোগ ব্যবস্থাও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। সুদূর তিব্বত, চিন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, পারস্য, গ্রীস, তুরস্ক থেকে ছুটে আসা বিদ্যানুরাগীদের।

ছাত্রদের প্রয়োজনীয় বইয়ের অভাব দূর করতে এবং একই সাথে ভিন্নভিন্ন শাখার জ্ঞানের সমাবেশ ঘটাতে তৈরি করা হয়েছিল তিনটি সুবিশাল লাইব্রেরী। লাইব্রেরী ভবনগুলি পরিচিত ছিল যথাক্রমে রত্নসাগর, রত্নদধি ও রত্নরঞ্জক নামে। লাইব্রেরীর নামকরণ থেকে অনুমান করা যায় নালন্দার শিক্ষকদের জ্ঞানের গভীরতা। চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর মতে, এখানে যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের জ্ঞানের খ্যাতি প্রসারিত ছিল বহুদূর। চারিত্রিক দিক থেকেও তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সৎ চরিত্রের অধিকারী। নির্লোভী এই শিক্ষকরা ভাল করেই অবগত ছিলেন, দূরদূরান্তের বহু ছাত্র বন্ধুর পথের কষ্ট মাথায় নিয়ে তাঁদের কাছে ছুটে আসতেন বিদ্যা-পিপাসায়। তাই তাঁরাও আন্তরিকতার সাথে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলেন। লাইব্রেরীর প্রতিটি ভবনের উচ্চতা ছিল সুবিশাল প্রায় ৯তলা বিশিষ্ট দালানের সমান। এত বিশাল ও সমৃদ্ধ লাইব্রেরী বর্তমান শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ছাপাখানা প্রযুক্তির সহজলভ্য যুগেও সচরাচর দেখা যায় না। প্রায় ৮০০ বছর ধরে লাইব্রেরীগুলি ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হয়েছিল হাজার হাজার পুঁথি, ধর্মীয় জ্ঞান, বিজ্ঞানের বই, চিকিৎসাশাস্ত্র ও নানান গবেষণালব্ধ মূল্যবান বই দিয়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লিখিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বইগুলি এখানে অনুদিত হত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান গরিমায় আর পাণ্ডিত্যে যাঁরা সে সময়ে উচ্চপর্যায়ে ছিলেন তাঁরাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নালন্দায় সন্মিলিত হয়েছিলেন। জ্ঞান আহরন ও বিতরণের জন্য ছাত্ররা ছিল প্রাণবন্ত, শ্রদ্ধাবান, সুযোগ্য ও বিদ্যোৎসাহী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সবাই এখানে সমবেত হওয়ার কারণে, ভিন্নতা ছিল তাদের ভাষায়, ভিন্নতা ছিল তাদের ধর্মে, ভিন্নতা ছিল তাদের সংস্কৃতিতে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। এই উদ্দেশ্যই তাদের করেছিল বিনয়ী ও ঐক্যবদ্ধ।

প্রসঙ্গক্রমে বলতেই হয়, এক সময় এত সুবিশাল একটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেছিলেন বাংলাদেশের সন্তান শীল ভদ্র। যিনি ছিলেন, হিউয়েন সাঙ-এর গুরু। প্রায় ২২ বছর হিউয়েন সাঙ তাঁর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চান্দিনাতে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আরও একজন স্বনামধন্য বঙ্গীয় পণ্ডিত ব্যক্তির কথা উল্লেখ না করে উপায় নেই, তিনি ছিলেন ঢাকার বিক্রমপুরে বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করা অতীশ দীপঙ্কর। বর্তমানে অতীশ দীপঙ্করের বাসস্থান “নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা” নামে পরিচিত। তিনি বেশ সফলতার সঙ্গে ১৫ বছর ওদন্তপুরী ও সোমপুর বিহারের শিক্ষকতা ও পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি আক্রমণে শতশত বছর ধরে অবদান রেখে আসা একটি সভ্য, উন্নত জাতি তৈরি ও জ্ঞান উৎপাদনকারী এই নিরীহ প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস হয়ে যায়। তার আক্রমণের বর্বরতা আকারে এত ভয়াবহ ছিল যে, এসম্পর্কে পারস্য ইতিহাসবিদ্ মিনহাজ তাঁর “তাবাকাতে নাসিরি” গ্রন্থে লিখেছেন “হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুককে আগুনে পুড়িয়ে ও গলা কেটে হত্যা করে সেখানে ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করেন খিলজি। এরপর আগুন লাগিয়ে দেন লাইব্রেরী ভবন গুলিতে। লাইব্রেরীতে বইয়ের পরিমান এতই বেশি ছিল যে কয়েক মাস সময় লেগেছিল সেই মহামূল্যবান বইগুলি পুড়ে ছাই হতে (জনশ্রুতি আছে ছয় মাস)। খিলজি শুধু নালন্দাকে পুড়িয়ে ছাই করেননি, একই সঙ্গে পুড়িয়ে ছাই করেছেন একটি জাতির সভ্যতা, ইতিহাস, প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অমূল্য বই, যা থেকে আমরা জানতে পারতাম সে যুগের ভারতবর্ষের শিক্ষার অবকাঠামো, তৎকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে। জাতি হিসাবেও হয়তো আমাদের পিছিয়ে দিয়েছে সহস্র বছর। সেদিন তার ধারালো তরবারির নিষ্ঠুর আঘাতে ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্তের বন্যার স্রোতে ভেসে যাওয়া নিরস্ত্র মানুষের আর্ত চিৎকারে ও জীবন্ত মানুষ-পোড়া গন্ধের সাথে বাতাসে ভেসে আসা বাচঁতে চাওয়া ঝলসানো সাধারণ মানুষগুলির করুণ আর্তনাদে স্তব্ধ হয়েছিল একটি সভ্য জাতির এগিয়ে চলা। এক শ্রেণির ধর্মান্ধদের চোখে খিলজির এই পাশবিক নিষ্ঠুর বর্বরতাও পরিচিতি পায় ধর্মীয় বিজয় হিসাবে! এই পোড়া ভগ্নস্তুপ থেকে নালন্দাকে আবারও মাথা তুলে দাঁড় করানোর শেষ চেষ্টা চালিয়েছিলেন মুদিত ভদ্র নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু। কিন্তু সেবারও পুনরায় তাতে আগুন লাগিয়ে দেয় ঈর্ষার আগুনে জ্বলতে থাকা দুই ক্ষুব্ধ ধর্মান্ধ ব্রাহ্মণ। আবারও এখানে ঘটে আরও এক সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয় বিজয়!

নালন্দায় বারবার ধর্মীয় বিজয় সফল হলেও লজ্জিত হয় মানবতা, পরাজিত হয় সভ্যতা, শৃঙ্খলিত হয় শিক্ষা। এভাবে উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনা, আক্রোশ, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে ধর্মান্ধরা কয়েকশো বছর ধরে মানবসভ্যতাকে আলোর পথ দেখানো, মানুষ গড়ার এই কারখানাটির বিলুপ্তি ঘটিয়েছিল পৃথিবী থেকে।

শ্রেণিকক্ষের বাইরের শিক্ষাই প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী শিক্ষা

প্রকৃত শিক্ষালাভের জন্য আপনার সন্তানকে সব সময়ই নোটবই, গাইড বই, কোচিং, বইয়ের থলে আর ব্লাকবোর্ডের সাথে লেগে থাকতে হবে না। সত্যিকারের শিক্ষা শুধু ঐতিহাসিক কিছু তথ্য মুখস্ত করা কিংবা কয়েকটি গণিতের সমাধান করা বা গ্রামারের কিছু নিয়ম জানা নয়। শিক্ষা হচ্ছে একধরনের জীবনব্যাপী ইন্টার-অ্যাকটিভ পদ্ধতি, যেখানে থাকবে প্রশ্ন করা, আলোচনা করা, ক্রিটিক্যালি কোনও কিছু চিন্তা করা, কোনও প্রচলিত বিষয়ের মধ্যে নতুন অর্থ খুঁজে বের করা এবং প্রতিটি অবস্থায় অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করা ইত্যাদি। ধরুন, টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত একটি খেলা দেখছেন। বিষয়টি কেমন? অবশ্যই মজার। কিন্তু ধরুন, আপনি স্টেডিয়ামে বা মাঠে সমর্থক কর্তৃক বেষ্টিত হয়ে খেলা দেখছেন। দুটোতেই কি একই ধরনের মজা পাবেন? বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা কোনও ভাবেই টেলিভিশনে বা প্রতিবিম্বের বা ইমেজের মাধ্যমে দেখানো সম্ভব নয়। শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শ্রেণিকক্ষে যে শিক্ষাদান করা হয়, অনেক সময়ই বাস্তব অবস্থার সাথে তার মিল থাকে না। আমাদের শিক্ষার্থীরা ইতালিয়ান রেনেসাঁ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে বই পড়ে, সেই জানা আর যদি ইতালিয়ান ভাস্কর্য দেখে, পেইন্টিং দেখে কিংবা একুরিয়াম স্বচক্ষে দেখে, তাহলে কি একই ধারণা হবে রেনেসাঁ সম্পর্কে? আমাদের অনেক বিদ্যালয়েই বিজ্ঞান পড়ানোর যন্ত্রপাতি নেই, থাকলেও ব্যবহার করা হয় না। ফলে শিক্ষার্থীরা দিনে দিনে বিজ্ঞান পড়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। শিক্ষার্থীরা প্রথমদিকে যখন ল্যাবরেটরিতে কাজ শুরু করে তখন খুব উত্তেজিত থাকে; কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পর অনেক এক্সপেরিমেনেন্টের বাস্তবের সাথে মিল থাকে না বলে তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এডুকেশন ইনিস্টিটিউটের অধ্যাপক মাইকেল রেইস বলেছেন, 'ক্লাসরুমের বাইরের কার্যাবলী শ্রেণিকক্ষের চেয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেশি বাড়ায়।'

শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য আমরা ফিল্ড ভিজিটের আয়োজন করে থাকি। মার্টিন ব্রন্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির অ্যাডজাঙ্কট প্রফেসরও বলেছেন, ফিল্ড ট্রিপের কথা - ফিল্ড ট্রিপের মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা শিক্ষার্থীরা অনেকদিন মনে রাখতে পারে। তারা সেখান থেকে সরাসরি যে উদাহরণগুলি দিতে পারে, তা বিদ্যালয় কিংবা শ্রেণিকক্ষ ভিত্তিক শিক্ষায় সম্ভব নয় । ফিল্ড ট্রিপ শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়; এটি ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, ইংরেজি সহ কারিক্যুলামের অন্যান্য সব বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমার মনে আছে, আমরা যখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম, শেক্সপিয়ারের যে নাটকটি যেদিন পড়ানো হবে শিক্ষকরা তার আগে বলতেন আগামীকাল বা তার পরদিন ব্রিটিশ কাউন্সিলে 'ম্যাকবেথ' নাটক মঞ্চস্থ হবে, তোমরা সবাই নাটকটি দেখবে। নাটক দেখে আসতাম এবং পড়ার সময় বারবার কোন চরিত্র কীভাবে আচরণ করত, কী

ভূমিকা পালন করত- নাটক পড়ার সময়ে চোখের সামনে তা ভেসে আসত। একদল শিক্ষার্থীদের যখন বায়োলজির জন্য ক্লাসরুমের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তারা ওইদিনের জন্য অন্যান্য বিষয়গুলির ক্লাসও করতে পারছে না। কাজেই অন্যান্য বিষয়কেও ফিল্ড ট্রিপের আওতায় আনা দরকার।

শিখন-শেখানো প্রকৃতিগতভাবেই স্বতস্ফুর্ত হতে পারে এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক হতে পারে যখন শিক্ষার্থীদের ক্লাসরুমের চার দেওয়ালের বন্দিদশা থেকে বাইরের মুক্ত বাতাসে নিয়ে আসা হয়। শিক্ষার্থীরা যখন কোনও বিষয় বাস্তবজীবনে অনুশীলন করার সুযোগ পায়, তখন শ্রেণিকক্ষের বাইরে এবং ভেতরে এক ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে এবং প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করতে পারে। অনেকের নিকট ফিল্ড ট্রিপ মানে দীর্ঘ বাস ভ্রমণ, শুকনো বা ভারী লাঞ্চ, উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে ঘুরে দেখা। অবশ্য ফিল্ড ট্রিপ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। তবে বাস্তব শিক্ষার জন্য ফিল্ড ট্রিপ একটু আলাদা, একটু পরিকল্পনামাফিক। এই ভ্রমণ বা ট্রিপ শিক্ষার্থীদের ভেতর আলাদা এক ধরনের সম্পর্ক কিংবা বন্ডিং তৈরি করে। উঁচু শ্রেণিতে এই বন্ডিং বিয়ে পর্যন্ত গড়াতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে দেখেছি, পিকনিক করতে গিয়ে যে প্রেমের শুরু তা বিয়েতে গিয়ে শেষ হয়েছে। বাইরের ভ্রমণ একজন শিক্ষার্থীকে গভীরভাবে অবলোকন করার বা দেখার জন্য শিক্ষকদেরকেও সুযোগ তৈরি করে দেয়। একজন শিক্ষার্থী পৃথিবীকে কীভাবে দেখছে, কোন দৃষ্টিতে দেখছে পৃথিবীকে, কোন অবস্থায় কীভাবে সাড়া দিচ্ছে, তা সঠিকভাবে এবং বাস্তবসম্মতভাবে দেখার একটি সুযোগ। একজন শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের এভাবে দেখে জানতে পারেন কোন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর কতটা পরিস্কার ধারণা আছে, যা শ্রেণিকক্ষে সব সময় কিংবা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

শ্রেণিকক্ষের বাধাধরা নিয়ম বা চার দেওয়ালের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার পথ হল, শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা। যাতে তারা তাদের চারপাশের মানুষের সাথে মিশতে পারে, প্রয়োজনে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারে। শিক্ষার্থীরা কমিউনিটির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে, আলাপ-আলোলোচনা করে কোনও বিষয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য নিতে পারে, সুন্দরভাবে বুঝতে পারে যা তার পাঠ্য বিষয়কে আরও সুন্দরভাবে বোঝার মশলা হিসেবে কাজ করে। আর এটি যে তাদের মানসিক শক্তি ও আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, তা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। শিক্ষাবিদ্ লরি গার্ডিনার ও ডন কলকুইট অ্যান্ডারসনের মতে, সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য আমরা কত শতাংশ সময় শ্রেণিকক্ষে ব্যয় করব আর কত শতাংশ শ্রেণিকক্ষের বাইরে ফিল্ড ট্রিপ, কমিউনিটি সার্ভিস, স্ট্যাডি ট্যুর বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ব্যয় করব, তার নির্দিষ্ট কোনও সূত্র নেই। যা প্রয়োজন অনুযায়ী ও শ্রেণিকক্ষের ভেতরে এবং বাইরে শিক্ষাদানের সাথে সমন্বয় সাধন করে করা যায়। অথবা যখনই শ্রেণিকক্ষে একঘেঁয়েমি আসে তখনই কাজে বদল আনার মাধ্যমেই সত্যিকারের ও ফলপ্রসূ শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। মাঠের অভিজ্ঞতা ও গবেষণা অনেক ন্যাচারাল সায়েন্স এবং সোশাল সায়েন্সের মূল বিষয়। বিজ্ঞানের একটি অংশ হচ্ছে মানবতা শেখানো, যা ফিল্ড ট্রিপের মাধ্যমে শেখা যায়। মানবিক শাখার অনেক অভিজ্ঞতা ফিল্ড ট্রিপের মাধ্যমে অর্জিত হয়। যেমন মৌখিক ইতিহাস সংগ্রহ, ঐতিহাসিক স্থাপনা পরিদর্শন, স্থানভেদে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। এছাড়াও ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য শ্রেণিকক্ষের বাইরের অভিজ্ঞতা শিখন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার্থীদের বাস্তব জ্ঞান আহরণের জন্য শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালের বাইরে যাওয়া একটি আবশ্যকীয় শর্ত । আমরা যদি উঁচু মানের শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করতে চাই, তাহলে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার সাথে বাইরের শিক্ষার সমন্বয় সাধন করতে হবে। শ্রেণিকক্ষের বাইরে গিয়ে শেখা শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধান, মূল্যায়ন-বিশ্লেষণ এবং কোনও বিষয়কে পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। শ্রেণিকক্ষের বাইরের অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে এবং ধীরে ধীরে তারা দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। তবে শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষকদের পুরো নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপ বা কার্যাবলী এর প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতার ওপর জোর দিতে হবে।

ধরুন, কয়েকদিন ধরে আবহাওয়া খারাপ ছিল। ঝড়, বৃষ্টি ছিল কিংবা মেঘলা আকাশ ছিল, গুমোট পরিবেশ বিরাজ করছিল। তারপর মেঘ কেটে গিয়ে আবহাওয়া ভাল হল, প্রকৃতি হাসতে শুরু করল, আপনি ক্লাস শুরু করলেন সেই চার দেওয়ালের মাঝে। বাস্তব চিন্তা করে দেখুন আপনার কতটা ভাল লাগবে! প্রকৃতিগতভাবে দেখবেন শিক্ষার্থীরা বারবার বাইরে তাকাচ্ছে। প্রকৃতি তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে বাইরে আসার জন্য। এসময় আপনি তাদেরকে ক্লাসরুমের ভেতরে কতক্ষণ আটকিয়ে রাখতে পারবেন? হ্যাঁ, আটকিয়ে রাখতে পারবেন তাদের দেহটা, কিন্তু মন কিন্তু বাইরে চলে যাবেই, কারণ তাদের মনের ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ নেই। আর প্রকৃত শিক্ষা ঘটে থাকে তখনই যখন শরীর ও মনের ইচ্ছে একই বিন্দুতে অবস্থান করে। আপনি যদি তাদের মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই তাদের মনের ভাব বুঝতে হবে। আর এই ভাব বুঝতে পারাটাই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষকের কাজ। আপনি যা পড়াচ্ছিলেন তাই পড়ান, কিন্তু শিক্ষার্থীদের মাঠে নামতে দিন, বিদ্যালয়ের আশেপাশে নিয়ে যান। দেখবেন প্রকৃতিগতভাবেই কতক্ষণ পরে তাদের স্বাদ মিটে যাবে এবং নিজেরাই আবার ক্লাসরুমে ফিরে আসতে চাইবে। আর না চাইলেও কিছুক্ষণ পরে আপনি তাদের নিয়ে আসুন, তারা আসবে কারণ মানব প্রকৃতি সব সময়ই পরিবর্তন চায়। এটিও এক ধরনের পরিবর্তন।

শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষা দেওয়ার বা গ্রহণ করার কয়েক ধরনের সুবিধা আছে। এখানে শিক্ষা বাস্তব পরিবেশে ঘটে বলে

শিক্ষার্থীদের কোনও বিষয়ের ওপর স্বচ্ছ ধারণা জন্মে, শিক্ষাগ্রহণ হয় বাস্তব এবং প্রাসঙ্গিক। যে বিষয়ের ধারণা শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের ভেতরে তৈরি করতে পারে না; উন্মুক্ত ও বিস্তৃত প্রকৃতির কোলে তা তারা সহজেই বুঝতে পারে। ধরুন, আপনি মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল ইত্যাদি পড়াচ্ছেন হয় ছবি এঁকে বা উদাহরণ দিয়ে। তা না করে আপনি যদি বিদ্যালয়ের পাশে কোনও বাগানে নিয়ে সরাসরি গাছ দেখাতে পারেন, তা হলে সে সহজে ব্যাপারগুলি বুঝতে পারবে এবং ওই শিক্ষার কথা তারা সহজে ভুলবে না। শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে আপনি তাদের পাখার ক্লিপ কিংবা বাঁধন খুলে দিলেন। তাদের মন উন্মুক্ত হল এবং উন্মুক্ত মন এমন কিছু সৃষ্টি করবে যা সম্পর্কে আপনি প্রস্তুত ছিলেন না, আপনি আবিষ্কার করতে পারেননি যে, ওই শিক্ষার্থীরা কী কী করতে পারে। এতদিন তারা পরিবেশ পায়নি বলে করতে পারেনি। আপনি যে বিষয়েই পড়ান না কেন, সব বিষয়ের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটবে। আমরা সবাই জানি যে, শিশুরা তখনই ভাল করে শেখে যখন তারা উৎফুল্ল, আনন্দিত ও কাজে ব্যস্ত থাকে। পর্যবেক্ষণ শিক্ষাগ্রহণের একটি চমৎকার পদ্ধতি। ছোট শিশুরা পানি (জল) বালু নিয়ে খেললেও তার মধ্যে থেকে অনেক কিছু শেখে, আর বয়স্করা প্রকৃতির রহস্য খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দু'দলই বাস্তব অবস্থা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে। এসব পরিবেশে শিক্ষাগ্রহণ করলে শিক্ষার্থীরা সহজেই মোটিভেটেড হয় ক্লাসরুমে আসার জন্য, কারণ তারা জানে তাদের শিক্ষাগ্রহণের জায়গা শুধু ক্লাসরুম নয়; উন্মুক্ত পৃথিবী এবং তাদের শিক্ষক সেইসব স্থান ও সুযোগ ব্যবহার করেন তাদের শিক্ষাদানের জন্য। বাইরে যাওয়ার ফলে তাদের মধ্যে স্বভাবগত একটি পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং তারা দায়িত্বপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করে। তখন তাদের আর অনেক কিছুই বলে দিতে হয় না, নিজে থেকেই করে। আর এই বিষয়গুলি শত চেষ্টা করেও আপনি ক্লাসরুমে শেখাতে পারবেন না। আপনি ক্লাসরুমের বাইরে গিয়ে শেখালেন - এতে আপনার শরীর বিশুদ্ধ হল ও উন্মুক্ত বাতাস গ্রহণ করার সুযোগ পেল। শিক্ষার্থীদেরও উন্মুক্ত ও বিশুদ্ধ বাতাস গ্রহণের সুযোগ হল, যা শরীর ও মনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন ক্লাসরুমে ঢুকে দেখুন - বিশেষ করে যেসব ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীরা গাদাগাদি করে বসে, সেখানে কী বিশ্রী গন্ধ যা শিক্ষার্থীদের প্রতি মুহূর্তে তাড়না দিচ্ছে দ্রুত ক্লাস শেষ করার। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে আপনাকে শিক্ষার্থীদের এক-দুই পিরিয়ড পরপর বাইরে নিয়ে যেতে হবেই। কর্তৃপক্ষকে বিষয়গুলির সুফল বর্ণনা করতে হবে এবং বোঝাতে হবে। শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষাদানের আরেকটি লাভজনক দিক হল, বিনা পয়সায় অবারিত শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার। এই উপকরণগুলি আপনাকে কিনতে হচ্ছে না। আর উপকরণ ছাড়া শিক্ষা তো সম্পূর্ণ হয় না। সর্বোপরি বলা যায়, ক্লাসরুমের বাইরের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা বাড়ায়, নৈতিক শিক্ষা উন্নত হওয়ার সুযোগ পায় কারণ তখন তারা বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি হয়। কোনও উদাহরণের মধ্যে তারা আবদ্ধ থাকে না, শিক্ষার্থীরা চতুর্মখী হয়, বিস্তৃত ও উন্মুক্ত পরিবেশে কাজ করার ফলে মানসিকতা উদার হয়, যা বদ্ধ ঘরে বসে সম্ভব নয়। প্রকৃতিগতভাবেই তখন তাদের ভেতর নেতৃত্বের গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়। এই বিষয়গুলি শিক্ষাদানের বা শিক্ষাগ্রহণ করার পূর্বশর্ত। কিন্তু এখন আমরা কী দেখছি, কী করছি বা কী চাচ্ছি? শিক্ষার্থীরা শুধু একটি ভাল গ্রেড পেলেই সবাই বাহবা দিচ্ছে, সবাই খুশি হচ্ছে, গ্রেডই হচ্ছে সবকিছু বিচারের মানদণ্ড। অথচ এটির সাথে বাস্তব জগতের খুব একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আপনি নিশ্চিত নন যে, শুধু গ্রেডের বদৌলতে একজন শিক্ষার্থী জীবনে অনেকদূর আগাবে। বরং যেসব শিক্ষার্থী বাস্তবজগত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে, বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তারাই জীবনে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। বাস্তব জগতে এর অনেক প্রমাণ আছে। আমরা অনেক সময় বলে থাকি, অমুক ছেলেটি ক্লাসে তেমন ভাল ছিল না অথচ সেই জীবনে ভাল করেছে। আসলে তার মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা ছিল, আমরা তা আবিষ্কারও করতে পারিনি কিংবা আবিষ্কারের পরিবেশও তৈরি করতে পারিনি। এটি আমাদের সম্মিলিত ব্যর্থতা। আমাদের দেশের ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির কিছু কিছু কাজ খুব প্রশংসনীয়। প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীদের কিছু প্রোজেক্ট-ওয়ার্ক করতে হয়। যেমন অটিস্টিক শিশুদের জন্য সহায়তা প্রদান করার নিমিত্তে তারা ফান্ড সংগ্রহ করে এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অটিস্টিকদের সহায়তা করে। বিষয়টির ওপর সেমিনারের আয়োজন করে, তাদের জন্য আর্ট এবং ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, অটিস্টিকদের মাঝে মাঝে পুরস্কার বিতরণ করে। এগুলির আয়োজন করা একদিকে যেমন সামাজিক দায়িত্বাবলী সম্পর্কে তাদের সচেতন করে, অন্যদিকে তাদের নেতৃত্বেও বিকাশ ঘটায়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে মেশার দক্ষতা বৃদ্ধি করে। মাঝে মাঝে তারা রাস্তায় ট্রাফিক সিগনাল মেনে চলার জন্য পথচারীদের সচেতন করে। রাস্তার ভিক্ষুকদের স্থায়ীভাবে কিছু করার জন্য সহায়তা প্রদান করে ও মোটিভেশন দিয়ে থাকে। আমাদের বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে মাঝে এধরনের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না। তারা শুধু ক্লাস আর কোচিং নিয়েই ব্যস্ত, তাদের জগত যেন এখানেই সীমাবদ্ধ।

লেখক পরিচিতিঃ মাছুম বিল্লাহ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (বেল্টা), ঢাকা, বাংলাদেশ।

নবদিশা-র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবি রায় কর্তৃক ৫/১/২/ জি, কর্ণফিল্ড রোড, কলকাতা – ৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত ও
শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা – ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত

FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY

নবদিশার পথিকের প্রতিক্রিয়া

তারিখঃ________________________

নামঃ______________________________ দূরভাষঃ________________________

ঠিকানাঃ____

পেশাঃ____

স্কুলের নামঃ____

(যদি প্রযোজ্য হয়)

নবদিশার গুণগত মানঃ ভাল ☐ খুব ভাল ☐ মাঝারি ☐ খারাপ ☐

নবদিশার বিষয়ঃ প্রাসঙ্গিক ☐ অপ্রাসঙ্গিক ☐

সৃজনশীলতাঃ ভাল ☐ খুব ভাল ☐ মাঝারি ☐ খারাপ ☐

প্রচ্ছদঃ ভাল ☐ খুব ভাল ☐ মাঝারি ☐ খারাপ ☐

লেখা দিতে ইচ্ছুকঃ হ্যাঁ ☐ না ☐

গুণগত মান নিয়ে মতামতঃ____

____

____

____

(অনুগ্রহ করে ফর্মটি কেটে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠানঃ
অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌, ৩২/৬ গড়িয়াহাট রোড (সাউথ)
কলকাতা - ৭০০০৩১

____
স্বাক্ষর

নবদিশা

নবদিশার ভাবনা

- গ্রাম বাংলার শিক্ষাঙ্গনে প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি আঞ্চলিক জীবনযাপন-নির্ভর শিক্ষার সংযোজিত প্রচেষ্টা।
- আঞ্চলিক জ্ঞান ও সংস্কৃতিই হবে সংযোজিত শিক্ষার মূল ভিত্তি।
- এর বাস্তব রূপায়ণে সাধারণ মানুষের স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত সরকার একটা উল্লেখযোগ্য অবদানের দিশারী হবে।

নবদিশার পথিক হন

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার খোঁজে শিক্ষক এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন তাঁদের চিন্তা – অভিজ্ঞতা বিনিময় করার মঞ্চ হল এই নবদিশা পত্রিকা।

আমরা আশা করি আপনাদের মতামত, শিক্ষা নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে সাধারণ পাঠক্রমের বাইরে কাজ করার অভিজ্ঞতা নবদিশা পত্রিকার মাধ্যমে বিনিময় হবে।

জানার জন্য, শেখার জন্য ও জানানোর জন্য।

আসুন, পথিক হন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ AHEAD Initiatives

৩২/৬, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা- ৭০০ ০৩১, টেলিফোন নং ঃ ০৩৩ ৪০৬৭ ০৩৬৯